গল্পমাল্য

শ্রীযতীন্দ্র মোহন সিংহ

মূল্য দেড় টাকা

প্রকাশক :—
শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ
ডায়মণ্ড হারবার,
(২৪ পরগণা)

মুদ্রাকর :—
শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ
দি ওরিয়েণ্ট প্রেস, ৫০ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্

উৎসর্গ

উচ্চাঙ্গের সৎসাহিত্য রচনায়

লব্ধপ্রতিষ্ঠা

শ্রীমতী অনুরূপা মাতার

হস্তে অর্পণ করিলাম।

৺বারাণসী
অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৪০

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ

নিবেদন।

এই কয়েকটি গল্প ও ব্যঙ্গচিত্র পূর্ব্বে মাসিক বসুমতী, মানসী, বিচিত্রা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। "আমিনা বিবির আত্মকথা" গল্পটি ভারতবর্ষে বাহির হইলে, চারিদিকে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল, কারণ ইহার এক স্থানে সুনীতিদূষক ভাবের ইঙ্গিত ছিল এরূপ কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন, যদিও আমি তাহা সম্পূর্ণ অন্য উদ্দেশ্যে লিখিয়াছিলাম। যাহা হউক আমি সে কয়েকটি লাইন কাটিয়া দিয়া আপদ শান্তি করিলাম। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে সুনীতির এরূপ প্রবল শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে মনে করিয়া, আমার "সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা" পুস্তক লেখা সার্থক হইয়াছে বুঝিয়া আমি তখন হর্ষানুভব করিয়াছিলাম। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে আমার সেই হর্ষ বিষাদে পরিণত হইয়াছে। একজন সমালোচক আমার প্রতি তাঁহার তীব্র ক্রোধ সংযত করিতে না পারিয়া আমাকে গালি দিয়া একখানা পুস্তিকা বাহির করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে "শনিবারের চিঠি" মাসের পর মাস অতি আধুনিক সাহিত্যের যে সকল ক্লেদ ঘাটিতেছেন, তাহার জন্য তিনি কয়খানা প্যাম্ফ্লেট ছাপিয়াছেন?

সাহিত্যক্ষেত্রে এরূপ ব্যক্তিগত আক্রোশ একেবারে বিরল নহে। একজন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক তাঁহার একখানা উপন্যাসের ভূমিকায় আমাকে অভদ্রোচিত ভাষায় গালি দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন, কারণ আমি ইতিপূর্ব্বে তাঁহার দুর্নীতিমূলক লেখার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছিলাম। পুস্তকের ভূমিকায় সমালোচককে গালি দেওয়া কিরূপ সুরুচিসঙ্গত তাহা তিনিই জানেন; শিষ্টসমাজে ইহা কাপুরুষতা বলিয়া গণ্য হইবে।

শ্রীযতীন্দ্র মোহন সিংহ

সূচীপত্র

ব্যঙ্গচিত্র

গ্রন্থকার রচিত অন্যান্য পুস্তক

১।	ধ্রুবতারা (উপন্যাস)			
	(৮ম সংস্করণ)	...	...	২৲
২।	উড়িষ্যার চিত্র			
	(৩য় সংস্করণ) ঐ	...	...	২৲
৩।	অনুপমা			
	(২য় সংস্করণ) ঐ	...	..	২৲
৪।	সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচার			
	(২য় সংস্করণ)	...	...	২৲
৫।	তোড়া (২য় সংস্করণ)	...	...	॥৹
৬।	তপস্যা ঐ	..	...	॥৹
৭।	সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা	...	...	॥৹

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,
প্রভৃতি দোকানে পাওয়া যায়।

রামকৃষ্ণের দুর্গোৎসব।

রামকৃষ্ণ রায়ের বাড়ীতে দুর্গোৎসব। তিনি দূরদেশে চাকুরী করেন। তখন রেল-ষ্টীমার হয় নাই, তাঁহাকে নৌকাপথে বাড়ী আসিতে হইত। তিনি পূজার তিন দিন পূর্ব্বে নৌকায় রওনা হইয়াছেন। বোধনের দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী পৌঁছিবার কথা। তাঁহার বহু যত্নে সংগৃহীত পূজার দ্রব্যাদি সঙ্গে রহিয়াছে, পূজার পূর্ব্বে বাড়ী পৌঁছান নিতান্ত আবশ্যক।

কিন্তু তিনি নৌকায় উঠিবার দ্বিতীয় দিনে দেবদুর্য্যোগ আরম্ভ হইল। নৌকা খুব বড় ছিল, তাহা সত্ত্বেও মাঝিরা বোধনের দিন প্রাতঃকালে একটা খালের ধারে নৌকা বাঁধিতে বাধ্য হইল। তখন প্রবল পদ্মানদীতে ঝড় উঠিয়াছে—উত্তাল তরঙ্গমালা গভীর গর্জ্জনে আকাশ কম্পিত করিতেছে, কাহার সাধ্য নদীতে নৌকা ধরে। নদীর অবস্থা দেখিয়া রামকৃষ্ণ বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বাড়ী এখনও বহুদূরে।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। দুর্য্যোগ কিছুমাত্র কমিল না; বরং বাড়িতে লাগিল। নিকটবর্ত্তী গ্রামে বোধনের বাজনা বাজিয়া উঠিল। সেই বাজনা শুনিয়া রামকৃষ্ণের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার

বাড়ীতেও মায়ের বোধন হইতেছে, আর তিনি এখন কোথায়? তিনি যে চিরদিন নিজে উপস্থিত থাকিয়া মায়ের বোধনাধিবাস সম্পন্ন করেন। ঐ যে পুরোহিত ঠাকুর বোধন-মন্ত্র পাঠ করিতেছেন—তাঁহার কাণে সেই মন্ত্র ধ্বনিত হইতে লাগিল—অমনি তাঁহার চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় অশ্রু বিগলিত হইল। তিনি মনে মনে মাকে সম্বোধন করিয়া সেই মন্ত্রের ভাবার্থ চিন্তা করিতে লাগিলেন। "মা, তুমি প্রবুদ্ধ হও! যেমন একদিন ব্রহ্মাদি দেবগণের স্তবে প্রবুদ্ধ হইয়াছিলে—যেমন একদিন অসুরাপহৃত দেব রাজ্যোদ্ধারের কামনায় ইন্দ্রের স্তবে প্রবুদ্ধ হইয়াছিলে—যেমন একদিন দশাননের নিধন-কামনায় দাশরথি রামের পূজা-দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়াছিলে—মা গো, আমি নিতান্ত অকিঞ্চন, আমার হৃদয়ে কি কৃপা করিয়া প্রকাশিত হইবে না?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বোধনের সময় অতিবাহিত হইল। তিনি নিতান্ত বিষণ্ণ চিত্তে নৌকায় বসিয়া রাত্রি কাটাইলেন। সেই ঝড়ের বেগ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল।

পরদিন শুভ সপ্তমী তিথি। ঝড়ের বেগ কমিয়াছে, কিন্তু অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছে। পদ্মা নদীতে তখনও তরঙ্গের তাণ্ডবনৃত্য চলিতেছে। রজনীপ্রভাতে নিকটবর্ত্তী গ্রামের পূজা-বাড়ীতে পূজার বাজনা বাজিতেছে। রামকৃষ্ণ কোনক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া, নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বাড়ীতে কিরূপে মায়ের পূজা হইতেছে? পূজার দ্রব্যাদি যে সমস্তই তাঁহার সঙ্গে। বাল্যাবধি তিনি পূজার সময় উপস্থিত থাকিয়া পূজার তত্ত্বাবধান করিয়া আসিতেছেন, আজ তাহা কে করিতেছে? ঐ যে পুরোহিত ঠাকুর বিল্ববৃক্ষমূলে বসিয়া "মেরু মন্দার-কৈলাস-হিমবচ্ছিখরে গিরৌ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতেছেন; ঐ যে তিনি নবপত্রিকার স্নান করাইতেছেন—সেই স্নানের প্রত্যেকটি মন্ত্র তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল। তার পরে দেবীর মহাস্নান।

মহাস্নানের সময় তিনি স্বহস্তে ঘট জলপূর্ণ করিয়া দেন, আজ কে তাহা দিতেছে? মহাস্নানের প্রাণস্পর্শী মন্ত্রগুলি তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল। তিনি সেই সকল মন্ত্রার্থ চিন্তা করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন—"মা গো! তুমি যদি এই অকিঞ্চনের কুটীরে শুভাগমন করিয়া থাক, তবে ঐ সকল ঘটপূর্ণ স্নানের জল গ্রহণ কর। কিন্তু তুমি রাজরাজেশ্বরী—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বহস্তে তোমাকে স্নান করাইয়া কৃতার্থ হন। তাঁহারাই বিবিধ বারিপূর্ণ কলসের দ্বারা তোমার অভিষেক করুন—

দেবাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ।
ব্যোমগঙ্গাম্বুপূর্ণেন আদ্যেন কলসেন তু॥

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদি দেবগণ মন্দাকিনীজলে প্রথম কলস পূর্ণ করিয়া তোমার অভিষেক করুন!

মরুতশ্চাভিষিঞ্চন্তু ভক্তিমন্তঃ সুরেশ্বরীম্।
মেঘতোয়াদিপূর্ণেন দ্বিতীয়কলসেন তু॥

হে সুরেশ্বরি! মরুদ্গণ ভক্তিযুক্ত চিত্তে মেঘবারিপূর্ণ দ্বিতীয় কলস দ্বারা তোমার অভিষেক করুন।

সারস্বতাদিতোয়েন সংপূর্ণেন সুরোত্তমাম্।
বিদ্যাধরাশ্চাভিষিঞ্চন্তু তৃতীয়কলসেন তু॥

হে সুরসুন্দরি! বিদ্যাধরগণ সরস্বতী আদি নদীর পবিত্র জলপূর্ণ তৃতীয় কলস দ্বারা তোমার অভিষেক করুন।

যক্ষাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু লোকপালাঃ সমাগতাঃ।
সাগরোদকপূর্ণেন চতুর্থকলসেন তু॥

যক্ষ ও লোকপালগণ সাগরোদকপূর্ণ চতুর্থ কলস দ্বারা তোমার অভিষেক করুন।

বারিণা পরিপূর্ণেন পদ্মরেণুসুগন্ধিনা।
পঞ্চমেনাভিষিঞ্চন্তু নাগাশ্চ কলসেন তু॥

নাগগণ পদ্মরেণু-সুগন্ধি জল দ্বারা পঞ্চম কলস পূর্ণ করিয়া তোমার অভিষেক করুন।

হিমবদ্ধেমকূটাদ্যা অভিষিঞ্চন্তু পর্ব্বতাঃ।
নির্ঝরোদকপূর্ণেন ষষ্ঠেন কলসেন তু॥

হিমালয়, হেমকূট প্রভৃতি পর্ব্বত সকল নির্ঝরোদক দ্বারা ষষ্ঠ কলস পূর্ণ করিয়া তোমার অভিষেক করুন।

সর্ব্বতীর্থাম্বুপূর্ণেন সপ্তমেন সুরেশ্বরীম্।
শক্রাদয়োঽভিষিঞ্চন্তু ঋষয়ঃ সপ্ত এব চ॥

ইন্দ্রাদি দেবগণ ও সপ্ত ঋষিগণ মিলিত হইয়া সর্ব্বতীর্থ হইতে সমানীত পবিত্র জল-দ্বারা সপ্তম কলস পূর্ণ করিয়া তোমার অভিষেক করুন।

বসবশ্চাভিষিঞ্চন্তু কলসেনাষ্টমেন তু।
অষ্টমঙ্গলসংযুক্তে দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥

অষ্টবসু অষ্টম কলস পূর্ণ করিয়া তোমার অভিষেক করুন। হে অষ্টমঙ্গলদায়িনি দুর্গে! তোমাকে নমস্কার।

এই মহা-ভাবময় স্নান-মন্ত্র স্মরণ করিতে করিতে রামকৃষ্ণের নয়নযুগল হইতে প্রেমাশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি তন্ময় হইয়া মায়ের মহিমা ধ্যান করিতে লাগিলেন।

স্নানান্তে বসন পরিতে হইবে। তিনি বহু যত্নে মায়ের পরিধানের জন্য যে সুন্দর রক্তবর্ণ চেলীর কাপড় আনিয়াছেন, তাহা ত তাঁহার সঙ্গেই রহিয়াছে। তিনি মাকে আজ সেই চেলীর শাড়ী দিয়া সাজাইতে পারিলেন না, ইহাতে তাঁহার হৃদয় যেন দগ্ধ হইতে লাগিল। মায়ের

নৈবেদ্যাদির জন্য অনেক ফলমূল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহাকে নিবেদন করিতে পারিলেন না। সারাদিন বসিয়া তিনি এই সকল কথা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার আহারের কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ, তিনি সমস্ত দিন উপবাসী থাকিতেন। সন্ধ্যার পরেও দুর্য্যোগের জন্য রন্ধনাদির কোন ব্যবস্থা হইল না। নৌকায় যে ফল-মূলাদি ছিল, তাহা তিনি মায়ের জন্য আনিয়াছিলেন, তাঁহাকে না দিয়া কি প্রকারে গ্রহণ করিবেন? এইজন্য বিন্দুমাত্র জলও গ্রহণ না করিয়া তিনি মনের দুঃখে শুইয়া পড়িলেন।

পূর্ব্ব রাত্রে ঝড়ের জন্য তাঁহার নিদ্রা হয় নাই, আজ ক্লান্ত শরীরে তাঁহার সহজেই নিদ্রাকর্ষণ হইল। গভীর নিদ্রার পরে রাত্রিশেষে তিনি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলেন। তাঁহার বাড়ীতে পূজা হইতেছে। তাঁহার পরিজনবর্গ তিনি না আসাতে অনেক কষ্টে যৎসামান্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া কোনক্রমে পূজা নির্ব্বাহ করিতেছেন। মায়ের পরিধেয় বস্ত্র তিনিই আনিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি না আসাতে গ্রামের দোকান হইতে একখানা লাল কস্তাপেড়ে আট হাতি শাড়ী আনিয়া দেওয়া হইয়াছে। পুরোহিত সেই কাপড় হাতে লইয়া মাকে নিবেদন করিতেছেন। এই স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে হঠাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন রাত্রি ভোর হইয়াছে। দুর্য্যোগ থামিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বাকাশে উষার কনকচ্ছটা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সহসা নিদ্রাভঙ্গে রামকৃষ্ণ নৌকা হইতে উঠিয়া তীরে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং দেখিলেন, অদূরে ঘাটে একটি ষোড়শবর্ষীয়া পরমসুন্দরী কন্যা দাঁড়াইয়া আছে—তাহার অঙ্গ হইতে অরুণ-কিরণ ফুটিয়া বাহির হইতেছে,—তাহার পরিধানে আট-হাতি কোরা কস্তাপেড়ে শাড়ী। তাহাকে দেখিয়া রামকৃষ্ণ "মা, তুমি কে?" বলিতে বলিতে তাহার সম্মুখীন হইলেন। বালিকাটি ঈষৎ হাস্যমুখে

বলিলেন, "আমাকে একখানা ভাল কাপড় দেবে? দেখ, আজ পূজার দিন আমার বাবা আমাকে যে কাপড় দিয়াছেন, তাহা বড় ছোট—আমার গা ঢাকে না।" বিদ্যুৎচমকের ন্যায় রামকৃষ্ণের মনে অমনি কি ভাবের উদয় হইল। "মা, তুমি দাঁড়াও—আমি তোমার জন্য ভাল কাপড় আনিতেছি"—বলিতে বলিতে তিনি নৌকায় ছুটিয়া গেলেন, এবং পূজার জন্য আনীত সেই চেলীর কাপড়খানি লইয়া সেই ঘাটের দিকে ধাবিত হইলেন। কিন্তু সে বালিকা কোথায়? চঞ্চলা চপলার ন্যায় সে বালিকা অন্তর্হিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ অমনি "মা দেখা দিয়ে কোথায় গেলি?" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গী লোকেরা ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে নৌকায় উঠাইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল।

তিনি যখন বাড়ী পৌঁছিলেন, তখন সন্ধ্যারতি শেষ হইয়াছে, পুরোহিত সন্ধিপূজার আয়োজন করিতেছেন। রামকৃষ্ণ অনুসন্ধানে জানিলেন, যথার্থই সপ্তমী-পূজাতে একখানি আট-হাতি কস্তাপেড়ে শাড়ী দিয়া মায়ের পূজা করা হইয়াছে। তিনি মায়ের অসাধারণ করুণার কথা স্মরণ করিয়া ভাব-বিহ্বল-চিত্তে আত্মহারা হইলেন। তাঁহার আনীত চেলীর শাড়ীর দ্বারা মায়ের সন্ধি পূজা সম্পন্ন হইল। তিনি সেই মহাসন্ধিক্ষণে মায়ের মৃন্ময়ী মূর্ত্তির মুখপানে তাকাইয়া যেন দেখিলেন, সেই নদী-তীরস্থ বালিকার ন্যায় মা মৃদুমৃদু হাসিতেছেন। তখন রামকৃষ্ণ মায়ের পদতলে পতিত হইয়া ভাব-বিহ্বল-চিত্তে স্তব করিলেন—

"ধন্যোঽস্মি কৃত-কৃত্যোঽস্মি সফলং জীবিতং মম।
আগতাঽসি যতো দুর্গে মাহেশ্বরী মমাশ্রমম্॥"

স্মৃতিরত্নের কাশীযাত্রা

এক

আশ্বিন মাসের রমণীয় প্রভাত। বৃক্ষে লতায় আকাশে বাতাসে শরতের শোভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। শঙ্করনাথ স্মৃতিরত্ন প্রাতঃস্নানান্তে স্তব পাঠ করিতে করিতে তাঁহার গৃহ প্রাঙ্গণে পুষ্প চয়ন করিতেছেন। কুন্দ, মল্লিকা, জবা, সেফালিকা, করবী, অপরাজিতা, দোপাটী ফুলে সাজি ভরিয়া তিনি পূজা গৃহে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায় আবৃত্তি শেষ করিয়া "ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সার্বর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে দেব্যা দূতসংবাদঃ।" বলিয়া দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

পূজাগৃহে তাঁহার বিধবা কন্যা বিমলা তাঁহার পূজার জন্য চন্দন ঘসিতেছিল। তিনি আসনে উপবেশন করিলে বিমলা বলিল—"বাবা চণ্ডীর এই অধ্যায়ে শুম্ভের দূতের সহিত দেবীর কথোপকথন আমার বড় ভাল লাগে।"

স্মৃতিরত্ন একটু হাসিয়া বলিলেন—"মা, তুমি উহার ভাবার্থ সব বুঝিতে পার?"

কন্যা বলিল—"শুম্ভ বলিতেছেন—মম ত্রৈলোক্যমখিলং মম দেবা বশানুগাঃ—ত্রৈলোক্যে বররত্নানি মম বশ্যান্য শেষতঃ" শুম্ভের মধ্যে এই "অহং" "মম" ভাবটা অত্যন্ত প্রবল। ইহা শুনিলে হাসি পায়।"

স্মৃতিরত্ন—"প্রবল হবে না? শুম্ভ যে দৈত্যেশ্বর, অসুর যোনিতে

তার জন্ম। গীতার সেই অসুর সম্পদের কথা একবার স্মরণ কর। "ঈশ্বরোঽহং অহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী। আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।"...আমিই ঈশ্বর, আমিই ভোগী, বলবান্ ও সুখী—আমার মতন আবার সংসারে কে আছে?" এই ত আসুরিক মনোবৃত্তির লক্ষণ। শুম্ভের মধ্যে এই আসুরিক ভাবটা অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় সে দেবতাদিগের পীড়ন আরম্ভ করিল। তাই দেবী স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া অসুরের বিনাশ সাধন করিলেন।"

বিমলা বলিল—"কিন্তু বাবা, সব সময়ে কি মা জগদম্বা এইরূপে অসুরের দর্পচূর্ণ করেন? আমরা ত দেখিতে পাই কত কত অসুর এই সংসারে দর্পভরে বিচরণ করিয়া কত লোকের প্রতি অত্যাচার করিতেছে. তাহাদিগকে ত তিনি দমন করেন না?"

"সময় হইলে অবশ্যই দমন করিবেন। মা সেই বিশ্বনিয়ন্ত্রীর ন্যায় বিচারে বিশ্বাস কর।" এই বলিয়া স্মৃতিরত্ন মহাশয় পুষ্পপাত্রে ফুলগুলি সাজাইতে লাগিলেন। বিমলা চন্দন ঘষা শেষ করিয়া বলিল, "বাবা আজ চাল বাড়ন্ত।"

স্মৃতিরত্ন ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন—"গৃহে তণ্ডুলো নাস্তি—কালিদাসের সেই কথা! মা, ভাবনা কি? মা অন্নপূর্ণা না খাওয়াইয়া মারিবেন না।" এই বলিয়া তিনি আচমন করিয়া পূজায় বসিলেন।

বৃদ্ধ শঙ্করনাথ দেশবিখ্যাত পণ্ডিত, কিন্তু তাঁহার অবস্থা সচ্ছল নহে। তাঁহার শিষ্য যজমান অনেক ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজী শিক্ষা পাইয়া তাঁহাদের অনেকেই ক্রিয়াকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন। শিষ্যদের মধ্যে বেশীর ভাগই দীক্ষা গ্রহণ করেন না, আবার কেহ কেহ সোজা পথে মুক্তি লাভের আশায় সন্ন্যাসীর শিষ্য হইয়াছেন। কয়েক বিঘা জমি ব্রহ্মোত্তর আছে, কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিতান্ত ভাল মানুষ

বলিয়া তাঁহার বর্গাদারগণ ফাঁকি দিয়া অধিকাংশ ফসল ভোগ করে, অতি অল্প পরিমাণই তাঁহাকে দেয়। বাড়ীতে একটি চতুষ্পাঠী আছে, আগে ১০।১২টি ছাত্র থাকিত এখন কমিতে কমিতে মাত্র তিনটিতে দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার পাণ্ডিত্যখ্যাতির জন্য দূরদেশ হইতে অনেক ছাত্র আসে, কিন্তু তিনি আহারদানে অসমর্থ বলিয়া তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হন। তাঁহার একমাত্র পুত্র গৌরীনাথ ব্যাকরণ শেষ করিয়া ইংরেজী পড়িতে গিয়াছে, কারণ তিনি বুঝিয়াছেন ইংরেজী পড়া ভিন্ন তাঁহাদের অর্থাভাব দূর হইবে না। তাঁহার কন্যা বিমলা অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, এখন তাহার বয়স অষ্টাদশ বৎসর। স্মৃতিরত্ন মহাশয় তাহাকে যত্ন পূর্ব্বক বাঙ্গলা ও সংস্কৃত শিক্ষা দিয়াছেন। বিমলা পরম সুন্দরী, তাহার দৈহিক সৌন্দর্য্য জ্ঞানালোকের সহিত মিলিত হইয়া তাহকে অপূর্ব্ব রূপবতী করিয়াছে। সেই সৌন্দর্য্যের উপর ব্রহ্মচর্য্যের লাবণ্য প্রতিফলিত হইয়া তাহাকে অসাধারণ জ্যোতির্ম্ময়ী করিয়াছে। স্মৃতিরত্ন মহাশয় প্রায়ই বলিয়া থাকেন,—"মা আমার সাক্ষাৎ ভগবতী, কিন্তু আমার দুবদৃষ্ট, তাই উহার জীবনে সুখ হইল না।"

দুই

পূজা শেষ করিয়া স্মৃতিরত্ন মহাশয় বাহিরের চতুষ্পাঠী গৃহে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার ছাত্রগণ আগেই পুস্তক হস্তে সেখানে বসিয়াছিল। তাহারা উঠিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া পাঠাভ্যাস আরম্ভ করিল। তিনি হুঁকা হস্তে ধূমপান করিতে করিতে তাহাদিগকে পাঠ দিতে লাগিলেন।

এই সময়ে তিনটি ভদ্রলোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া

তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহারা দেশবিখ্যাত জমিদার ধরানাথ রায় চৌধুরীর কর্ম্মচারী। তাঁহাদের মধ্যে সব-ম্যানেজার হরেন্দ্র বাবু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট নিজের পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন,—"পণ্ডিত মহাশয়! আমাদের জমিদার বাবু আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।"

স্মৃতিরত্ন মহাশয় বলিলেন, "আপনাদের জমিদার বাবু এখন কোথায়?"

"আজ্ঞে, তিনি রাজধানী ছাড়িয়া এই দিকেই ভাওয়ালিয়া নৌকায় আসিতেছেন। কাল শ্যামনগরের কাছারিতে পৌঁছিবেন। আমরা আগে আসিয়াছি।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় কিঞ্চিৎ নস্য গ্রহণ করিয়া বলিলেন "আমার নিকট কি প্রয়োজন বলুন।"

হরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"আমাদের জমিদার বাবুর বড় ছেলে রণজিৎ বাবু ব্যারিষ্টারি পড়িবার জন্য তিন বৎসর পূর্ব্বে বিলাত গিয়াছিলেন। তিনি পরীক্ষায় পাশ করিয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। জমিদার বাবু তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া সমাজে তুলিতে ইচ্ছা করেন, সে সম্বন্ধে দেশস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা সংগ্রহ করিতেছেন। এই দেখুন অনেক পণ্ডিতই মত দিয়াছেন, কিন্তু আপনি হইতেছেন এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়, আপনার মত গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। তাই আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন, আর প্রণামীও কিঞ্চিৎ পাঠাইয়াছেন।"

এই বলিয়া হরেন্দ্র বাবু দুইশত টাকার নোট স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের পদপ্রান্তে রাখিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার হাত হইতে অন্যান্য পণ্ডিতগণের স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপত্রখানি লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি

কাগজখানির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন,—"এই সকল মত গ্রহণের প্রয়োজন কি ?"

হরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"আজ্ঞে আমি আপনার কথা বুঝিতে পারিলাম না।"

"আমার বলিবার তাৎপর্য্য এই, দু চারি শ টাকা খরচ করিলেই যখন অনুকূল ব্যবস্থা পাওয়া যায়, তখন এই সকল ব্যবস্থার মূল্য কি ?"

হরেন্দ্র বাবু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন "আজ্ঞে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণই সমাজের নেতা, তাঁহাদের মতের একটা মূল্য আছেই ত ?"

"কিন্তু সমাজে থাকিয়া যাহারা অসংখ্য পাপাচরণ করিতেছে, তাহাদিগকে কেহ আটকাইতেছে কি ? এই ধরুন আপনার জমিদার বাবু। বিলাত ফেরতগণ বিলাতে যাইয়া যে সকল অনাচার করে, তিনি ঘরে বসিয়াই সে সকল করিতেছেন। নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ, সুরা পান ইত্যাদি শাস্ত্রে যে সকল মহাপাপ বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহার কোনটাই ত তিনি বাকি রাখেন নাই।"

হরেন্দ্রবাবু বলিলেন—"পণ্ডিত মহাশয়! মাপ করিবেন। আমার মনিবের নিন্দা শুনিতে আপনার নিকট আসি নাই। আপনি তাঁহাকে এ সকল পাপকার্য্য করিতে দেখিয়াছেন কি ?"

"দেখার প্রয়োজন হয় না। জগতে অনেক বিষয়ই আমরা আপন চক্ষুতে না দেখিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই। আপনি অবশ্যই জানেন আমি কাহারও খোসামোদ করিয়া কথা বলি না। তিনি হাজার বড়লোক হউন, আমি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জানি তাহা স্পষ্টরূপে বলিতে একটুও ভয় করি না। তাঁহার পিতার আমলের যে সকল দেবসেবা ছিল তিনি তাহা ভুলিয়া দিয়াছেন; তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ যে সকল ব্রহ্মোত্তর দিয়াছিলেন তিনি তাহা বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। তাঁহার

অত্যাচারে কত শত প্রজা ভিটা-ছাড়া হইয়াছে। যাহার যত খাজনা তাহার দেড়গুণ দ্বিগুণ দিয়াও নিস্তার নাই। তিনি মানী লোকের মান রাখেন না। গৃহস্থের সুন্দরী স্ত্রী দেখিলে তিনি ছলে বলে কৌশলে—"

হরেন্দ্র বাবু উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিলেন—"মহাশয়! থামুন, থামুন। আপনি ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিতেছেন। আপনি কাহাকে এরূপ অপমান করিতেছেন জানেন?"

"খুব জানি। তিনি শুম্ভদৈত্যের ন্যায় ক্ষমতাশালী, তাই ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া এরূপ একাধিপত্য করিতেছেন। তাঁহার পুত্রকে সমাজে তুলিবেন, তাহাতে আবার ব্রাহ্মণপণ্ডিত লইয়া পুতুল নাচানোর প্রয়োজন কি? আপনি এই টাকা তুলিয়া নিন্।"

হরেন্দ্র বাবু রুষ্ট হইয়া বলিলেন—"সে কথা ভাল ভাবে আগে বলিলেই ত হইত। আপনি তাঁহার অপমান না করিয়াও ত একথা বলিতে পারিতেন। আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন, জমিদার বাবু একথা শুনিলে আপনাকে এজন্য অনুতাপ করিতে হইবে। আপনি মান্যমান ব্যক্তি, ইহার অধিক আর আপনাকে বলা উচিত হইবে না।"

এই বলিয়া হরেন্দ্র বাবু নোটগুলি তুলিয়া লইয়া সদলবলে প্রস্থান করিলেন।

বিমলা অন্তরালে দাড়াইয়া এই সকল কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। সে আসিয়া বলিল,—"বাবা, এ কি করিলেন?"

স্মৃতিরত্ন মহাশয় বলিলেন,—"কেন মা? আমার টাকা ফেরত দেওয়া অন্যায় হইয়াছে তাই বলিতেছ?"

বিমলা জিব কাটিয়া বলিল,—"না—না—আমি সে কথা বলিতেছি না। সে জমিদার যে রকম দুর্দ্দান্ত লোক—"

"তা' আমি জানি। কিন্তু আমাকে ঘুস দেওয়ার চেষ্টা! আমি এরূপ আচরণ কখনও ক্ষমা করিতে পারি না। সে জন্য দু'কথা শুনাইয়া দিলাম। আমি জানি সে খুব অত্যাচারী লোক, কিন্তু কি করিব? আমার ন্যায়বুদ্ধিতে আঘাত লাগিলে আমি নির্ব্বাক থাকিতে পারি না। ওহো, তুমি ত বলিয়াছিলে মা, ঘরে চাল বাড়ন্ত, এবার সেই চেষ্টায় বাহির হইতেছি।"

তিন

ইহার সাত দিন পরে বিমলা বাড়ীর অনতিদূরে নবগঙ্গা নদীতে সন্ধ্যাকালে গা ধুইতে গিয়াছিল, কিন্তু সে আর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল না। স্মৃতিরত্ন মহাশয় সেই রাত্রেই তাহাকে খুঁজিবার জন্য চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইলেন, পাড়া প্রতিবেশিগণ সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া তাহাকে খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কন্যার শোকে নিতান্ত অধীর হইলেন, কারণ তাঁহার পত্নী-বিয়োগের পর এই বিধবা কন্যাই ছিল তাঁহার সংসারের একমাত্র অবলম্বন। আর মেয়েটির চরিত্রগুণে তিনি তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিন দিন পরে একটি লোক আসিয়া সংবাদ দিল, বিমলা প্রায় ৬ মাইল দূরে কমলাপুর গ্রামে অনাথনাথ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে আছে। তিনি তাহাকে নবগঙ্গার জলে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া মৃতপ্রায় অবস্থায় তুলিয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছেন। স্মৃতিরত্ন যেন অকূল সাগরে কূল পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ শ্রীদুর্গা স্মরণ করিয়া কমলাপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথে যাইতে যাইতে তাঁহার মনে একটা খট্‌কার উদয় হইল। কমলাপুর ত তাঁহার গ্রাম হইতে

নদীর উজান দিকে। বিমলা হঠাৎ গভীর জলে পড়িয়া স্রোতের টানে ভাসিয়া বিপরীত দিকে যাইবে কেন ?

স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে দেখিয়া বিমলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"বাবা, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে ! আমি আপনার কুলকলঙ্কিনী কন্যা, আমি জলে ডুবিয়া মরিলাম না কেন ?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন,—"কেন মা, কি হয়েছে ? সব খুলিয়া বল।" বিমলা চক্ষু মুছিয়া বলিল—"বাবা, আমি সেদিন গা ধুইবার জন্য নদীর জলে নামিয়াছিলাম, একখানা নৌকা নদী দিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ সেই নৌকা হইতে দুইজন লোক চিলের মত ছোঁ মারিয়া আমাকে সেই নৌকায় তুলিয়া লইল এবং আমার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। নৌকা তীরবেগে ছুটিয়া স্রোতের বিপরীত দিকে চলিল এবং প্রায় তিনঘণ্টা পরে একখানা ভাওয়ালিয়া নৌকার পাশে লাগাইল।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"এ বুঝি সেই জমিদারের ভাওয়ালিয়া ? মা জগদম্বা ! তোমার মনে এই ছিল।"

"সেই ভাওয়ালিয়ায় একটা আলো জলিতেছিল, একজন লোক নৌকার ছাদের উপর শুইয়া ছিল। যাহারা আমাকে ধরিয়া নিয়াছিল তাহাদের প্রশ্নের উত্তরে সে লোকটা বলিল—"বাবু এখন কাছারি বাড়ীতে আছেন, আমাকে খবর দিতে বলিয়াছেন আমি যাইতেছি। তোমরা ও মেয়েটিকে ঐ ভিতরের কামরায় নিয়ে রাখ।" এই বলিয়া সে লোকটি নামিয়া গেল। তাহারা আমার মুখ খুলিয়া দিয়া আমাকে নৌকার মধ্যে লইয়া গেল। আমি সেখানে বসিয়া চারিদিক ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। তখন সে কামরায় আর কেহ ছিল না। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে সেই লোকটি আসিয়া বলিল—"বাবু অত্যন্ত মদ খাইয়া মাতাল হইয়া পড়িয়াছেন,

তাঁহাকে উঠানো গেল না। এখন ইহাকে লইয়া তোমরা কি করিবে কর।”

তখন যাহারা আমাকে আনিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন বিরক্ত হইয়া বলিল—“আমরা আবার কি করিব? আমাদের কাজ আমরা করিয়াছি। এ লোক এখন তোমার জিম্বায় রহিল। খবরদার যেন পালায় না। আমরা এখন নৌকা ভাসাইলাম। আমাদের এখানে থাকার হুকুম নাই। আমরা রাজধানীতে চলিলাম।” এই বলিয়া তাহারা নৌকা খুলিয়া তীরবেগে চলিয়া গেল। তখন সেই নৌকার লোকটি আমাকে বলিল—“ওগো, তুমি কেঁদো না। ঐ ওখানে শুকনো কাপড় আছে তাই পরো, ঐ যে থালায় খাবার আছে, খাও। খাইয়া ঐ বিছানায় শুইয়া থাকো। তোমার কোন ভয় নাই। আমি ছাদের উপরে আছি। খবরদার সোরগোল করিও না।” এই বলিয়া সে বাহির হইতে কামরার দরজা বন্ধ করিয়া উপরে উঠিয়া গেল। আমি অনেকক্ষণ সেইভাবে বসিয়া রহিলাম। পরে যখন তাহার কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না, তখন আস্তে আস্তে কামরার একটা জানালা খুলিলাম, এবং খুব সন্তর্পণে নদীর জলে পড়িলাম। আমি সাঁতার কাটিতে কাটিতে স্রোতের বেগে অনেক দূর ভাসিয়া আসিলাম, কিন্তু ক্রমে হাত পা অবসন্ন হইয়া আসিল, এবং আমার চৈতন্য লোপ হইল। পরদিন ভোরে আমার যখন চৈতন্য হইল, তখন দেখি এই ভদ্রলোক আমার শুশ্রূষা করিতেছেন। কিন্তু বাবা, আমার জলে ডুবিয়া মরাই উচিত ছিল, আমা হইতে আপনার নিষ্কলঙ্ক কুলে কালী পড়িল!”

এই বলিয়া বিমলা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

স্মৃতিরত্ন মহাশয় এই বৃত্তান্ত শুনিয়া অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া

রহিলেন। পরে "দুর্গা! দুর্গা! মা তোমার মনে এই ছিল!" বলিয়া গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

গৃহস্বামী অনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন,—"স্মৃতিরত্ন মহাশয়, বিপদে অধীর হইবেন না। ভাগ্যক্রমে আমি তখন ঘাটে গিয়াছিলাম নচেৎ মার জীবন রক্ষা হইত না।"

স্মৃতিরত্ন বলিলেন,—"কি ঘোর অত্যাচার! আমাদের দেশে কি কোন রাজা বা রাজপুরুষ নাই যিনি ইহার প্রতিবিধান করিতে পারেন? আমরা কি যথার্থই শুম্ভ দৈত্যের মুলুকে বাস করিতেছি? চক্রবর্ত্তী মহাশয়, জানেন ত—কেবল আমার কন্যা বলিয়া নহে—এইরূপ কত কুল-ললনার উপর সেই পাষণ্ড এইরূপ অত্যাচার করিতেছে, ইহার কি কোন প্রতিকার নাই? আমার অপরাধ আমি সেই কথা মুখ ফুটিয়া বলিয়া ছিলাম। হায় হায় হায়।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন—"আপনি পুলিসে এজাহার দিতে পারেন।"

স্মৃতিরত্ন বলিলেন—"পুলিস? পুলিস ত তার কেনা গোলাম। বিচারালয়ে নালিশ করিলেও কোন ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ সে টাকার বলে সাক্ষী বাধ্য করিয়া ও বড় বড় উকীল ব্যারিষ্টার লাগাইয়া খালাস হইয়া যাইবে, লাভের মধ্যে আমাদের ঘোরতর লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে। বিশেষতঃ মামলা মোকদ্দমা করাতে যথেষ্ট টাকা খরচের দরকার, আমি নিতান্ত গরীব, টাকা কোথায় পাইব। না, চক্রবর্ত্তী মহাশয়, আমি সে দিকে যাইব না। মা জগদম্বা কত শত দৈত্যদানব দলন করিয়াছেন, তিনি নারীর সতীত্বধর্ষণকারী এই দৈত্যকে দলন করিবেন না? আমি তাঁহারই নিকট বিচার প্রার্থনা করিব। এখন আমার কি কর্ত্তব্য তাই বলুন।"

অনাথবন্ধু বলিলেন—"ঘটনা ত আপনার কন্যার মুখে আনুপূর্ব্বিক

শুনিলেন। ইঁহাকে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। ইনি নিষ্পাপ, ইঁহাকে এখন বাড়ীতে লইয়া যান।”

ভট্টাচার্য্য মহাশয় সন্দিগ্ধচিত্তে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—“উঁহুঁ। আমরা যেন উহার কথা বিশ্বাস করিলাম, কিন্তু সকলে বিশ্বাস করিবে কি? এমন যে সতীকুলশিরোমণি জানকী, দুর্জ্জন লোকে তাঁহার কথাও ত বিশ্বাস করে নাই?”

বিমলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—“বাবা, আমিও সীতার পথ অবলম্বন করিতে চাই। তিনি প্রথমে আগুনে, পরে রসাতলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আমি প্রথমে জলে ডুবিয়াছিলাম, এবার কাপড়ে আগুন ধরাইয়া মরিব। আমি কিছুতেই লোকের গঞ্জনা সহ্য করিতে পারিব না, কিছুতেই আপনার মাথা হেঁট হইতে দিব না।”

স্মৃতিরত্ন মহাশয় বলিলেন—“মা তুই বলিস্ কি? এই কি তোর শিক্ষার ফল? আত্মহত্যা যে মহাপাপ। আত্মঘাতী লোকের কিছুতেই উদ্ধার নাই। আমাদিগকে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে বিদ্রোহী হইলে চলিবে না।”

অনাথবন্ধু বলিলেন—“স্মৃতিরত্ন মহাশয়! আমাদের সমাজে কত স্ত্রীলোক স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়া অনায়াসে চলিয়া যাইতেছে। হয়ত তাহাদের লইয়া কিছুদিন পর্য্যন্ত একটা হৈ চৈ পড়ে, একটা দলাদলির সৃষ্টি হয়, পরে কালক্রমে তাহারা সমাজ-শরীরে মিশিয়া যায়। আপনি নিজেও ত কত পাপীলোকের প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়া তাহাদিগকে সমাজে চালাইয়াছেন। সে সকলের তুলনায় আপনার কন্যা ত দেবতা, প্রাক্তনের ফলে উঁহার গায় সামান্য একটু আঁচ লাগিয়াছে মাত্র। আপনি ইচ্ছা করিলেই ইঁহাকে লইয়া স্বচ্ছন্দে সমাজে চলিতে পারেন। আপনার কার্য্যের দোষ ধরিতে পারে কাহার সাধ্য?”

স্মৃতিরত্ন বলিলেন,—“চক্রবর্ত্তী মহাশয়! আমাকে আপনারা যেরূপ মনে করেন, সেই পরিমাণে সমাজে আমার দায়িত্বও খুব বেশী। আমি অনেক পাপীকে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়াছি, সে জন্য আমার নিজের বেলায় আমাকে অতি সাবধান হইয়া চলিতে হইবে। লোকে বলিবে—অমুক ভট্টাচার্য্যের কন্যাকে লম্পট জমিদার ধরিয়া নিয়া গিয়াছিল, ভট্টাচার্য্য জানিয়া শুনিয়া তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, তবে অন্যের বেলায় তিনি কঠোর ব্যবস্থা দেন কিরূপে? সুতরাং আমার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া লোকে ব্যভিচারের মাত্রা বাড়াইয়া দিবে।”

চক্রবর্ত্তী বলিলেন—“কিন্তু আপনার কন্যার সহিত তাহাদের তুলনাই হইতে পারে না। ইঁহাকে ত কেবল ধরিয়া নিয়া গিয়াছিল –”

স্মৃতিরত্ন বলিলেন—“আপনি বুঝিতেছেন না। লোকে, বিশেষতঃ দুষ্ট লোকে, কি তাহা বিশ্বাস করিবে?”

চক্রবর্ত্তী—“কিন্তু যে স্ত্রীলোককে কেহ জোর করিয়া ধরিয়া নিয়া তাহার সতীত্বনাশ করে তাহারও ত প্রায়শ্চিত্ত আছে?”

স্মৃতিরত্ন—“আছে বৈ কি। প্রায়শ্চিত্ত করিলে সে স্ত্রীলোক অবাধে সমাজে চলিতে পারে। কিন্তু আমার কন্যা যে নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক,—আমি তাহাকে কোন প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিতে পারিব না, সেও কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিতে রাজি হইবে না।”

চক্রবর্ত্তী—“তবে আপনি এখন কি করিতে চান?”

স্মৃতিরত্ন—“আমি ইহাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিব না, আবার আমি এই সমাজের শীর্ষস্থানে থাকিয়া সমাজেরও পাপ বাড়াইব না। সমাজ আমাদিগকে পরিত্যাগ না করিলেও, সমাজের কল্যাণের জন্য আমিই সমাজকে পরিত্যাগ করিব। আমি আমার কন্যাকে লইয়া

দেশত্যাগ করিয়া বারাণসী ধামে যাইব,—"যেষামন্যা গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ।" তুমি কি বল, মা?"

বিমলা বলিল—"বাবা ইহাই উত্তম পরামর্শ।"

স্মৃতিরত্ন মহাশয় বিমলাকে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, অল্প-দিনের মধ্যে তাঁহার জমিজমা ঘর বাড়ী বিক্রয় করিয়া ৺কাশীধামে যাত্রা করিলেন। তাঁহার পুত্রও সেখানে গিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইল। দেশের লোক তাঁহার জন্য হাহাকার করিতে লাগিল।

চার

উক্ত ঘটনার পর এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। স্মৃতিরত্ন মহাশয় কাশীতে আসিয়া নিজ অগাধ পাণ্ডিত্য ও বিশুদ্ধ চরিত্রবলে পণ্ডিতসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বাসায় ১০।১২টি ছাত্র নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। তিনি প্রায় সব পণ্ডিতসভায় নিমন্ত্রণ পান এবং তাহার দ্বারা তাঁহার সংসার খরচ বেশ চলিয়া যাইতেছে। বিমলা এক জমিদার-কন্যা-প্রতিষ্ঠিত বিধবা-আশ্রমে বালিকা-দিগকে বাঙ্গলা ও সংস্কৃত শিক্ষা দিয়া বেশ আনন্দে সময় কাটাইতেছে।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিমলা ৺কেদারনাথের মন্দিরের সম্মুখে গঙ্গার ঘাটে বসিয়া গঙ্গার শোভা দেখিতেছিল। সেখানে অনেক মহিলা বসিয়া গল্পগুজব করিতেছিলেন, কেহ কেহ বা জপতপ করিতে-ছিলেন। অর্দ্ধচন্দ্রাকার গঙ্গার সুবিন্যস্ত সোপানশ্রেণীর উপর দিয়া নানা বর্ণের বেশধারী স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকার প্রবাহ চলিয়াছে। দূর দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে কীর্ত্তনের খোলের শব্দ ও অস্ফুট কলরব ভাসিয়া আসিতেছে। সুদূর মণিকর্ণিকায় জলন্ত চিতার অগ্নিশিখা এবং পার্শ্বস্থ হরিশ্চন্দ্র

ঘাটে শ্মশানের অগ্নিশিখা—জীবনপ্রবাহের দুই প্রান্তে শ্মশান, মানুষ! তুমি যে দিকেই যাও তোমার এই শ্মশানেই পরিসমাপ্তি, এই কঠোর সত্যকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

"ওমা—আমি এত সিঁড়ি ভাঙ্গতি পারি না—ওলো সৈরবি, আমার হাতখানা ধর তো, মা,"

বিমলা পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল এক স্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়া খুব জাঁকজমকের সহিত দুইটি পরিচারিকা সহ ঘাটে আসিতেছেন। তিনি আসিয়া বিমলার পাশে বসিলেন। বিমলা তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিল—"মা, আপনার দেশ কোথায়? আপনার কথা শুনিয়া আপনাকে আমাদের এক জেলার লোক বলিয়া বোধ হইতেছে।"

প্রৌঢ়া বলিলেন—"আমার বাড়ী প্রতাপপুর জেলায়, তোমার বাড়ীও সেইখানে নাকি?"

বিমলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"হ্যাঁ মা, একদিন সেখানেই ছিল। আমরা এই এক বৎসর হইল দেশ ছাড়িয়া আসিয়াছি।"

"কাহার সাথে আসিয়াছ?"

"আমার বাবার সাথে, তিনি একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।"

"তেনার নাম কি?"

"শঙ্করনাথ স্মৃতিরত্ন।"

প্রৌঢ়া রমণী সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন—"শঙ্করনাথ স্মৃতিরত্ন? শঙ্করনাথ—তুমি তাঁর মেয়ে? আমরা যে তেনারে কতদিন তালাস কর্‌তিছি।"

বিমলা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কেন, তাঁহাকে কেন? আপনি কে?"

এই সময় একজন পরিচারিকা বলিল, "এনারে চিন্‌তি পারিল্যা না—ইনি আমারগো ছ্যাশের রাজা দয়ানাথ বাবুর গিন্নী।"

বিমলা বিমর্ষ হইয়া বলিল—"এবার চিনিয়াছি, আর পরিচয়ে প্রয়োজন নাই। আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়া কি এখনও আপনাদের আশ মেটে নাই?"

জমিদার-গৃহিণী কাতর হইয়া বলিলেন, "মা, সে কথা আর তুলিও না। ব্রাহ্মণের অভিশাপ, সতীলক্ষ্মীর শাপ আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আজ ছ'মাস হইল আমার বড় ছেলে, যে বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছিল, সে মোটর গাড়ী থেকে পড়িয়া মারা গিয়াছে। আমার স্বামীও ভয়ানক পীড়িত, তাঁহার লিভারে ফোড়া হইয়াছে, কখন কি হয় বলা যায় না। এখন বাবা বিশ্বনাথ কেদারনাথ ভরসা। তিনি কেবলই বলেন, আমার পাপের পেরাচিত্তি হচ্ছে, এখন একবার সেই ব্রাহ্মণরে পালি তাঁর পার ধূলো নিয়ে বাঁচতাম। তোমারগে বাসা কোথায় মা?"

বিমলা তাহাদের ঠিকানা বলিল। এই সময়ে ৺কেদারনাথের আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিল। জমিদার গৃহিণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মা তোমার বাবারে আমারগে দুঃখের কথা কইও, তিনি যেন একটু দয়া করেন। আমরা ভেলুপুরায় থাকি। ওলো বামি! আমার হাতখানা ধরতো। বাবা কেদারনাথ! কেরপা কর।" এই বলিয়া তিনি দুইটি দাসীর সাহায্যে আস্তে আস্তে সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরের বাহিরে রাস্তার উপরে তাঁহার গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল।

পাঁচ

বিমলা বাড়ী আসিয়া তাহার পিতাকে এই সকল কথা বলিল। পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, সে জমিদারের লোক বোধ হয় কালই আপনাকে ডাকিতে আসিবে। আপনি যাবেন কি?"

স্মৃতিরত্ন মহাশয় একটু হাসিয়া বলিলেন, “মা, তুমি কি বল ? যাওয়া উচিত না অনুচিত ?”

বিমলা চুপ করিয়া রহিল। স্মৃতিরত্ন মহাশয় বলিলেন, “মা, আমি মা জগদম্বার নিকটে সেই অপরাধীর দণ্ডের প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তিনি তাহার যথেষ্ট দণ্ড দিয়াছেন। আমরা এখন বাবা বিশ্বনাথের ধামে বাস করিতেছি, এখানেও যদি আমাদের বৈরি-নির্য্যাতনের স্পৃহা বলবতী হয়, তবে আমাদের কাশীবাস বৃথা। সে যখন এতদূর অনুতপ্ত হইয়াছে, আমি তাহাকে নিশ্চয়ই দেখিতে যাইব। তারপরে, বিবেচনা করিয়া দেখ ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। দেশ-ত্যাগ করিবার সময় আমাদের মনে অপরিসীম কষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু এখানে আসিয়া ৺বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণার কৃপায় আমরা ত বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই আছি। তুমিও এখানে তোমার উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র পাইয়াছ।”

পরদিন প্রাতঃকালে একজন কর্ম্মচারী স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে জমিদারের বাসায় লইয়া গেল। তিনি ধরানাথের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তিনি বিছানায় শুইয়া আছেন, উত্থানশক্তিরহিত। স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে দেখিয়া তিনি হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং তাঁহার পদধূলি লইবার জন্য হাত বাড়াইলেন। তিনি পদধূলি দিলে, তাহা মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া বলিলেন, “ঠাকুর, আপনি মানুষ ন'ন দেবতা, তা' না হইলে আমার মত পাপীকে কেন দর্শন দিবেন। আপনি আমার যে সকল পাপ-কার্য্যের উল্লেখ করিয়াছিলেন, আমি তাহার প্রত্যেকটী কবুল করিতেছি। আমি গরম রক্তের জোরে ও প্রবৃত্তির তাড়নায় না করিয়াছি এমন পাপ নাই। কিন্তু আমার শাস্তিও যথেষ্ট হইয়াছে। যে ছেলের জন্য রাগের বশে আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াছিলাম সে আমাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে।”

এই বলিয়া ধরানাথ বাবু চক্ষু মুছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "মৃত্যু দৈবাধীন ঘটনা, সেজন্য শোক করা বৃথা। এখন আপনি কেমন আছেন?"

ধরানাথ গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "আর এক কথা বলি। আপনার কন্যার সতীত্বনাশের অভিপ্রায় আমার ছিল না, কেবল রাগের বশে আপনাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাহাকে আনিয়াছিলাম। মা আমার সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক। যাক সে কথা—আমারও এখন অন্তিমকাল, লিভারে ফোঁড়া হইয়াছে,—অতিশয় অত্যাচারের ফলে,—ডাক্তারেরা বলিয়াছেন অস্ত্র করিতে হইবে, কিন্তু অস্ত্র করিবার সময়ই মরিতে পারি। আপনি আমাকে ক্ষমা করিলেন, অন্তিম-কালে এই কথাটা প্রাণ খুলিয়া বলুন. আমি তাহা হইলে শান্তিতে মরিতে পারিব।"

স্মৃতিরত্ন মহাশয় গদগদ কণ্ঠে বলিলেন—"বাবা, তোমার যখন এতটা অনুতাপ হইয়াছে, আমি তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিলাম। ক্ষমাই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। বাবা বিশ্বনাথ তোমার মঙ্গল করুন।"

এই সময়ে পাশের কক্ষে স্ত্রীকণ্ঠের কাতর ক্রন্দন ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। স্মৃতিরত্ন মহাশয় উঠিয়া আসিবার সময় ধরানাথের গৃহিণী আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ইহার তিন দিন পরে ধরানাথ ধরাধাম হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিলেন।

———

সখীর বিপত্তি

এক

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পুণ্যময় স্মৃতি-বিজড়িত কাটোয়া নগরীতে অনেক সাধু মোহান্ত আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। মোহান্ত নিতাইচরণ দাস বাবাজীর নাম দেশপ্রসিদ্ধ। অনেক দূর হইতে অনেক বৈষ্ণব ভক্ত আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে পাবনা জেলা নিবাসী একটি ভক্ত আসিয়া তাঁহার আখড়ায় বাস করিতেছে। তাহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম ছিল কুমুদকান্ত বাগছী; এখনকার নাম চম্পকলতা।

কুমুদ যখন স্কুলে পড়িত তখন তাহার বালিকাসুলভ সুকুমার আকৃতি, মৃদু ও সলজ্জভাব সহজেই তাহার সহপাঠিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাহারা ঠাট্টা করিয়া তাহাকে কুমুদিনী বলিয়া ডাকিত। সে পাবনা জেলা-স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় পড়িতে আসিল। সেখানে একটা কলেজে দুই বৎসর অধ্যয়ন করিল, কিন্তু তাহার এফ-এ পরীক্ষা দেওয়া হইল না। সে একদিন একজন বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারকের বক্তৃতা শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল, এবং পিতামাতাকে না জানাইয়া সেই মহাত্মার সঙ্গে বৃন্দাবনধামে চলিয়া গেল। সেখানে দুই বৎসর থাকিয়া সন্ন্যাসীর বেশে যখন সে পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার মাতা তাহাকে দেখিয়া "হায়! হায়!" করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার পিতা অত্যন্ত তেজস্বী

পুরুষ ছিলেন, তিনি তাহার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিলেন না। তখন সে মাতার চরণে বিদায় লইয়া কাটোয়া আসিয়া নিতাইদাস বাবাজীর শিষ্য হইল। বৃন্দাবনে বাসকালে কুমুদ সখীভাবের উপাসনায় আকৃষ্ট হইয়াছিল। এখানেও সেই ভাবের সাধন গ্রহণ করিয়া কুমুদকান্ত বাগছী সখী-চম্পকলতা হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকের বেশভূষা ধারণ করিল। তাহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, সুবঙ্কিম ভ্রুযুগল, লাবণ্যমণ্ডিত মুখশ্রী ও সুদীর্ঘ কেশকলাপের সহিত রঙিন শাড়ী ও আঙরাখা, হাতে চুড়ী, গলায় হার, কাণে দুল অতি উত্তমরূপে মানাইল। নিতাইদাস বাবাজীর আখড়ায় কোন স্ত্রীলোক ছিল না, চম্পকলতা সেই আখড়াবাসীদের জন্য রন্ধনাদি কার্য্যের ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিল।

দুই

বেলা অপরাহ্ণ। মোহান্ত বাবাজী মধ্যাহ্ন সেবার পর বিশ্রাম করিতেছেন। চম্পকলতা তাহার গৃহকার্য্য শেষ করিয়া বাবাজী মহাশয়ের পদসেবা করিতেছে। বাবাজীর একটু নিদ্রার আবেশ হইয়াছিল, তিনি জাগ্রত হইয়া বলিলেন—"জয় গৌরাঙ্গ বল।" চম্পকলতাও "জয় গৌরাঙ্গ" বলিল।

বাবাজী বলিলেন—"আমাকে একটু গ্রন্থ পাঠ করিয়া শোনাও।"

চম্পকলতা তখন শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। যেখানে মহাপ্রভু পুরীধামে রথস্থিত শ্রীশ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ দর্শন কয়িয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে গাইয়াছিলেন, "আজ পরাণ নাথে পাইলুঁ" ইত্যাদি—চম্পকলতা তাহা পড়িতে লাগিল। মোহন্ত বাবাজী ভাবে বিহ্বল হইয়া "আহা আহা" করিতে লাগিলেন এবং চম্পকলতাকে

বলিলেন—"বুঝলে কি না—মহাপ্রভুর এখানে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি হয়েছে। তিনি যে জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র নিমাই একথা ভুলে গেছেন। তিনি মনে করেছেন, তিনি বৃন্দাবনে শ্রীমতী রাধিকা। শ্রীকৃষ্ণ রথে চড়ে তাঁকে দর্শন দিতে এসেছেন তিনি সেই দর্শনানন্দে বিভোর হয়ে নৃত্য করছেন। আহা কি মধুর ভাব! আমাদিকেও রাগমার্গে সাধন করতে হ'লে এই রকমে আপনাকে ভুলে যেতে হবে। তুমি যে অমুক বাগছীর পুত্র কুমুদ নাথ বাগছী তা একদম ভুলে যেতে হবে। সদা সর্ব্বক্ষণ নিজেকে অন্তরে বাহিরে, আচারে ব্যবহারে একটী স্ত্রীলোক বলে ধারণা করবে। এই ধারণা সিদ্ধ হলে, তবে তুমি নিজেকে শ্রীরাধিকার একজন সখী জ্ঞানে রাগমার্গে ভজনের অধিকার লাভ করবে। আমার কথা বুঝলে ?"

চম্পকলতা মস্তক অবনত করিয়া বলিল,—"আজ্ঞে বুঝেছি। আমি ত বাহ্যিক বেশভূষায় এই ভাবেই সাধনা করছি, কিন্তু মনে মনে নিজেকে স্ত্রীলোক ভাবা বড় কঠিন বোধ হয়।"

বাবাজী সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন—

"কঠিন বৈ কি ? নিজের ঈশ্বরদত্ত স্বভাবের পরিবর্ত্তন করা কি সহজ সাধ্য গা ? তবে অভ্যাস করতে করতে স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়। আরসুলা সব সময় কাঁচপোকা ভাবতে ভাবতে নিজে কাঁচপোকা হয়ে যায়। তুমি জীবনের প্রতি কার্য্যে নিজেকে স্ত্রীজ্ঞান করতে অভ্যাস কর।"

এই সময় একটি ভৃত্য একখানি টেলিগ্রাম আনিয়া বাবাজীর হাতে দিল। তিনি তাহা খুলিয়া চম্পকলতাকে পড়িতে দিলেন। চম্পকলতা তাহা পড়িয়া বিমর্ষ হইয়া বলিল—"আমার পূর্ব্বাশ্রমের পিতা অত্যন্ত পীড়িত, আমাকে দেখতে চেয়েছেন।"

বাবাজী বলিলেন—"তুমি আজই বাড়ী যাও, বিলম্ব কোরো না।"

চম্পকলতা একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—"আমি ত এই বেশেই যাব ?"

"অবশ্য। তুমি বেশ পরিবর্ত্তন করতে পার না। কৃষ্ণের ইচ্ছায় তোমার কোন অমঙ্গল হবে না।"

তিন

রাত্রি ৪টার সময় একখানা ট্রেণ রাণাঘাট হইতে পোড়াদহ অভিমুখে রওনা হইল। তাহার ইণ্টার ক্লাসের মেয়েদের গাড়ীতে পাঁচ ছয়টি মহিলা শুইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন উঠিয়া গোসল খানায় প্রবেশ করিলেন। সেখান হইতে ফিরিবার সময় তিনি দেখিলেন একটি অবগুণ্ঠনবতী রমণী জড়সড় হইয়া এক কোণে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথায় উঠলে গা ?"

অবগুণ্ঠনবতী বলিলেন—"এই রাণাঘাটে।"

"তুমি কোথায় যাবে ?"

"অনেক দূরে।"

"তোমার সঙ্গে আর কে আছে ?"

"আমি একলা যাচ্ছি।"

"একলা অনেকদূরে যাবে, তোমার ত সাহস কম নয় বাছা ?"

অবগুণ্ঠনবতী নীরব রহিল। পরে সেই মহিলাটি তাহার খুব নিকটে ঘেঁসিয়া বসিয়া তাহার সহিত নানা কথা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সে প্রায় নীরব থাকিয়া দুই এক কথায় জবাব দিতে লাগিল। এইরূপে রাত্রি ভোর হইল, গাড়ী জয়রামপুর ষ্টেশনে দাঁড়াইল। এ পর্য্যন্ত সেই মহিলাটি অবগুণ্ঠনবতীর মুখ দেখিতে পান নাই, কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে

তাঁহার মনে কি যেন সন্দেহ হইল। “ভাই তোমার দেখছি ভারী লজ্জা —মুখ চোখ খোল না কেন?” এই বলিয়া তিনি তাহার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন। তাহার মুখপানে তাকাইয়া তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—“ওগো তুমি ত মেয়েলোক নও—তুমি যে ব্যাটা ছেলে! তুমি মেয়েদের গাড়ীতে কেন উঠেছ? ওগো তোমরা সব ওঠো—গাড়ীতে ডাকাত এসেছে এখনই ছুরি মেরে সব লুঠ করে নিয়ে যাবে।”

তাঁহার এই চীৎকার শুনিয়া অন্যান্য মেয়ে যাত্রীগণ উঠিয়া বসিল এবং যে যাহার বোচকা বাক্‌স হাত দিয়া আগলাইয়া ধরিয়া সকলে এক সঙ্গে জড়সড় হইয়া বসিয়া আগন্তুকের প্রতি রোষদিগ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। আগন্তুক কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

এক বুদ্ধিমতী রমণী এলারম্ (Alarm) শিকল ধরিয়া টান দিলেন, অমনি গাড়ী থামিয়া গেল। সেই মেয়ে-গাড়ীর সংলগ্ন পুরুষদের কামরা হইতে দুই তিনটি লোক “কি হয়েছে—কি হয়েছে?” বলিয়া দৌড়াইয়া আসিল। গার্ড সাহেবও তাড়াতাড়ি আসিয়া “ক্যা হুয়া?” বলিয়া গাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। তখন একটি ভদ্রলোক গার্ড সাহেবকে ব্যাপার কি বুঝাইয়া দিলেন। তখন গার্ড সেই অবগুণ্ঠবতীকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। গাড়ী আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

ইহার পরেই চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। গার্ড অবগুণ্ঠনবতীকে গাড়ী হইতে নামাইল এবং পুলিস ডাকিয়া তাহার জেম্বা করিয়া দিল। গার্ড তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—“টোম্ কোন্ হ্যায়? টোম্ ডাকু হ্যায়?”

সে মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল—“না।”

“টোমার নাম ক্যা হ্যায়?”

“আমার নাম চম্পকলতা।”

গার্ড হাসিতে হাসিতে বলিল—"শম্পক—শ্যাম্পক শ্যাম্পেন—শ্যাম্পেন লোটা। A very sweet name (বড় মধুর নাম)"

এই সময় ষ্টেশন মাষ্টার চন্দ্রবাবু আসিয়া পড়িলেন। তিনি চম্পক-লতার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—"বাপু হে, তোমার মুখে ত দেখছি দাড়ী গজাচ্ছে—আজ বুঝি কামাবার সুবিধে পাও নি? অথচ মেয়েলোকের মতন শাড়ী গয়না প'রে মেয়েদের গাড়ীতে উঠেছিলে, আবার নামও বল্‌ছ চম্পকলতা! ব্যাপারখানা কি বল ত? তোমার বুঝি জেল খাটবার সখ হয়েছে?"

ইহার উত্তরে সে বলিল—"আমার নাম চম্পকলতা ঠিকই বলেছি। এর বেশী কিছু বলতে পারবো না। এখন আপনাদের যা কর্ত্তব্য হয় করুন। কৃষ্ণের ইচ্ছায় যা হয় হবে।"

ষ্টেশন মাষ্টার বলিলেন—"আচ্ছা তাই হবে। হে নীলবসনা বৈষ্ণবী ঠাকরুণ! আপাততঃ আপনি ঐ লালপাগড়ীর সঙ্গে গমন করুন। বেলা ১১টার সময় ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে হাজির হবেন।"

চার

চুয়াডাঙ্গার সবডিভিজন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট রসানন্দ বাবুর কোর্টে আজ মস্ত ভিড়, কারণ পুলিশ সেই নীলবসনা সুন্দরীকে বিচারের জন্য উপস্থিত করিয়াছে। একজন কনেষ্টবল তাহাকে আসামীর কাঠগড়ার মধ্যে পুরিয়া দিল। কোর্ট সাবইন্‌সপেক্টর মোকদ্দমার কাগজ পেস করিলে, হাকিম আসামীর দিকে সকৌতুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মৃদু হাস্য করিলেন। পরে আসামীর জবানবন্দী লিখিতে আরম্ভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার নাম কি?

"চম্পকলতা।"

হাকিম মুচকি হাসিয়া আর কোন পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিয়া নিজের মনে কি লিখিলেন, এবং তাঁহাকে পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন, "তুমি মেয়েদের গাড়ীতে উঠেছিলে ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"পুরুষ মানুষ হ'য়ে কেন মেয়েদের গাড়ীতে উঠেছিলে ?"

"আজ্ঞে আমি নিজেকে পুরুষ বলে' স্বীকার করি না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, শ্রীরাধিকা পরমপ্রকৃতি, আমি শ্রীরাধিকার সখা।"

এই কথা শুনিয়া কোর্টের লোক হাসিয়া উঠিল। হাকিমও সেই হাসিতে যোগ দিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিন্তু তুমি যাই মনে কর, রেলের আইন তোমাকে স্ত্রীলোক স্বীকার করবে না। সেই আইন অনুসারে তুমি অপরাধের কার্য্য করেছ। বুঝলে ?"

"আজ্ঞে, তবে আমি আইনানুসারে অপরাধী। আমার দণ্ডবিধান করুন।"

আসামীর এই কথা শুনিয়া হাকিম রায় লিখিলেন—"The accused pleads guilty, he is fined Rs. 10."

পরে আসামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমার দশ টাকা জরিমানা।"

রায় প্রকাশ হইলে কনেষ্টবল আসামীকে কোর্ট সাবইনস্পেক্টারের ঘরে লইয়া গেল। হাকিম এজলাস হইতে উঠিয়া গিয়া খাসকামরায় বসিলেন এবং পেস্কারের নিকট দশ টাকা দিয়া আসামীকে ছাড়িয়া দিতে হুকুম দিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে চম্পকলতা খাসকামরায় আনীত হইল। হাকিম দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাকে বলিলেন, "কি রে কুমুদিনী! তোর এ দশা কেন ?"

চম্পকলতা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া রসানন্দ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তিনি আবার বলিলেন, "আমাকে চিনতে পারলি নে? আমি যখন পাবনায় ছিলাম, তুই আমার ভাই সত্যানন্দর সঙ্গে পড়েছিলি। সত্যর সঙ্গে আমার বাসায় প্রায়ই আসতিস।"

চম্পকলতা এবার আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া বলিল, "দাদা, এবার আপনাকে চিনেছি। আমাকে মাপ করুন। কিন্তু তখন ত আপনার মুখে লম্বা দাড়ী ছিল, এখন দাড়ীগোঁফ কামিয়েছেন, আমি চিনব কি করে'?"

"ওরে আমার যে বয়স বাড়ছে—কাঁচা পাকা গোঁফ দাড়ী দেখতে ভাল নয় সেইজন্যে ফেলে দিয়েছি। দাড়ীটা যখন সম্পূর্ণভাবে পাকবে তখন আবার দাড়ীগোঁফ রেখে একটা ঋষি টিসি হব, তুই যেমন দাড়ীগোঁফ কামিয়ে রাধিকার সখী হয়েছিস। জানিস ত—The world is a stage and we are all players!—যাক্ আজ তুই কোথা থেকে আসছিস? বাড়ীর সব ভাল ত?"

"না দাদা। আমি কাটোয়াতে বাবাজী মহাশয়ের আখড়ায় ছিলাম কাল টেলিগ্রাম পেলাম যে বাবার বড্ড ব্যারাম। তাই তাঁকে দেখতে, যাচ্ছি।"

"এখন বুঝি পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে এই পথ ধরেছিস?"

"আজ্ঞে হাঁ, সবই কৃষ্ণের ইচ্ছা।"

"তা মন্দ নয়, রকমওয়ারি বটে। আর বি-এ, এম্-এ পাশ করেই বা কি হত? আমার ভাই সত্যটা দুবার বি-এ ফেল করে এখন ষাঁড়ের গোবর হয়ে বসে আছে।"

"সত্য এখন কোথায়?"

"কলকাতায় থাকে আর টো টো কোম্পানির চাকরি করে।

মাঝে মাঝে এখানেও আসে। ভাল কথা, তোর বোধ হয় খাওয়া দাওয়া হয় নি? চল্ আমার বাসায় চল্।"

এই বলিয়া রসানন্দ বাবু তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইলেন এবং কাছারির সন্নিকটে নিজের বাসায় চলিলেন। কাছারির তামাসা প্রিয় লোকেরা হা করিয়া তাকাইয়া রহিল। মোক্তার লাইব্রেরীতে বসিয়া রমেশ বাবু মোক্তার বলিলেন, "তাই ত আমাদের হাকিম বাবু যে কৃষ্ণ-ভক্ত তাতো আগে জানতাম না!" আর একজন সুরসিক মোক্তার বলিলেন, "অমন সুন্দরী বৈষ্ণবী পেলে কে না কৃষ্ণভক্ত হয়? তবে এখন তাঁর অনুকম্পা।" রসানন্দ বাবুর যে কিঞ্চিৎ "আলুদোষ" ছিল ইহা সকলে জানিত।

রসানন্দ বাবু বাসায় আসিয়া বৈঠকখানাঘরে চম্পকলতাকে বসিতে দিয়া অন্তঃপুরে স্ত্রীর সহিত দেখা করিতে গেলেন। তাঁহার গৃহিণী দূর হইতে চম্পকলতাকে আসিতে দেখিয়াছিলেন। রসানন্দ বাবু বলিলেন, "ওগো আমার একটী সখী এসেছে, দেখবে এস।"

তাঁহার গৃহিণী ক্রোধভরে বলিলেন, "মরণ আর কি! যা করবে মফস্বলে গিয়ে কর। ঐ কাছারিময় লোক গিস গিস করছে, তাদের সামনে দিন দু'পহরে বাসাতে এ কি কাণ্ড! আর ও মাগীরই বা আক্কেল কি রকম? ও কোন সাহসে বাসায় এল?"

"তাতে দোষ কি? তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। আমার সখী কি না, তাই তোমার সঙ্গে সই পাতাবে বলে এসেছে।"

"ঝাঁটা মারো সইয়ের মাথায়!"

এই বলিয়া গৃহিণী দপ দপ করিয়া পা ফেলিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন। রসানন্দ বাবু মনে করিলেন, গৃহিণী যথার্থ ই ঝাঁটা আনিতে

যাইতেছেন। তিনি একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ওগো একটা কথা শোনই না। অত রাগ কেন? তিনি আমাদের বাড়ীতে অতিথ হ'য়ে এসেছেন—অতিথকে খেতে না দিলে তোমার পাপ হবে।"

গৃহিণী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "ভারি ত পাপ পুণ্যি শেখাতে এসেছেন; তোমার এই সব কাণ্ড দেখে আমার গলায় দড়ি দিয়ে মোরতে ইচ্ছে করে!"

এই সময়ে বাহিরের ঘরে কথোপকথনের শব্দ শুনা গেল। পরক্ষণেই "বৌদিদি—ও বৌদি আমি এসেছি"—বলিতে বলিতে সত্যানন্দ বাড়ীর ভিতরে আসিল। আসিয়াই বলিল—"বৌদি—একটা মজা দেখে যাও, শীঘ্র এস।"

গৃহিণী অপ্রসন্নচিত্তে বলিলেন—"তোমাদের মজা তোমরাই দেখ গিয়ে। তুমি এখন বুঝি কলকাতা থেকে এলে? খেয়ে এসেছ?"

"সে কথা পরে হবে, তুমি একবার এসই না। আমার মাথা খাও, বৌদি, এস।"

গৃহিণী অগত্যা সত্যর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। রসানন্দ বাবুও তাঁহাদের অনুগমন করিলেন। সত্য বৈঠকখানার দরজায় দাঁড়াইয়া বলিল,—"বৌদি—ঐ দেখ কে এসেছে। ওকে চিনতে পার?"

এই কথা বলিতেই চম্পকলতা আসিয়া গৃহিণীকে গড় হইয়া প্রণাম করিল। তিনি হতভম্ব হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন। কৌতুকপ্রিয় রসানন্দ বাবু দূরে দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখিতে লাগিলেন।

সত্য আবার বলিল, "কি, চিন্‌লে না বুঝি বৌদি? ও সেই পাবনার কুমুদিনী। আমাদের বাসায় কত আসতো, তুমি আমাদের দুজনকে কত খেতে দিতে।"

রসানন্দবাবু এবার সাহস ভরে বলিলেন, "আগে ছিল কুমুদ, পরে হ'লো কুমুদিনী, এখন হয়েছে চম্পকলতা, শ্রীরাধিকার সখী।"

গৃহিণী এবার হাসিয়া বলিলেন, "তোমার ওসব তামাসা রাখ। ব্যাটাছেলে আবার রাধিকার সখী! এ সব তোমার কারসাজি। আমাকে জব্দ করবার জন্যে তুমিই ওকে মেয়েলোক সাজিয়ে বাড়ীতে এনেছ।"

রসানন্দবাবু বলিলেন, "দোহাই ধর্ম্মের! কস্মিন্ কালেও আমার সে মতলব ছিল না। আমি বরং কাছারিতে বোসে ওর দশ টাকা জরিমানা করেছি। ঐ আর্দ্দালীকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবে। যাক্ এখন ও বেচারাকে কিছু খেতে দাও, ও এখন পর্য্যন্ত জলস্পর্শ করে নি।"

সত্য বলিল, "আমিও ভোরে চা খেয়ে বেরিয়েছি, বৌদি। আমাদের দুজনের খাবার জোগাড় কর। ওগো চম্পকলতা, তুমি স্নান টান করবে নাকি?"

রসানন্দবাবু অবসর বুঝিয়া গৃহিণীর প্রতি সকৌতুক কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদে কাছারিতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার যে এখনও অনেকগুলি মোকদ্দমার বিচার করিতে হইবে।

গৃহিণী বলিলেন, "সখী চম্পকলতা, এবার এস দেখি ভাই। তোমার খবর কি শুনি। ও ঠাকুর, এই বাবুদের জন্যে দুটো ভাত চড়িয়ে দাও— ডাল তরকারী সব আছে।"

আহারান্তে চম্পকলতা সত্যর সঙ্গে অনেকক্ষণ নানা কথায় অতিবাহিত করিল ও বৈকালে চারিটার ট্রেণে দেশে রওনা হইল। সত্য তাহার সঙ্গে ষ্টেশনে আসিয়া তাহাকে পুরুষদের গাড়ীতে তুলিয়া দিল।

প্রতিশ্রুতি-পূরণ

এক

বেলা ৩টা বাজিয়াছে। কলিকাতা শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের একটি বড় বাড়ীর দোতলার বৈঠকখানায় গৃহস্বামী অমলকৃষ্ণ মিত্র একখানা কৌচে বসিয়া বই পড়িতেছিলেন। তাঁহার পায়ের কাছে মেঝের কার্পেটের উপর বসিয়া তাঁহার চতুর্দ্দশবর্ষবয়স্কা কন্যা সুনীলা একটা খাতায় কি লিখিতেছিল। লেখা শেষ হইলে সে বলিল,—

"বাবা, দেখুন—এবার শুদ্ধ ক'রে লিখেছি।"

অমল বাবু তাঁহার পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন,—

"দে—দেখিন্, সেকেণ্ড্ ক্লাসে পড়িস্, তোর এ রকম সব ভুল হয়।"

এই বলিয়া তিনি খাতাখানা হাতে করিয়া মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলেন। মেয়ে একটি অপরাধীর মত তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া আঁচলের খুঁট মুখে পুরিয়া চিবাইতে লাগিল।

এই সময় সিঁড়িতে জুতার শব্দ হইল; সঙ্গে সঙ্গে একটি বৃদ্ধ ও একটি যুবক সটান উপরে উঠিয়া আসিল। এই দুইটি লোককে হঠাৎ এইরূপে অনধিকার প্রবেশ করিতে দেখিয়া অমল বাবু বলিয়া উঠিলেন,—

"মশাই, এ কি রকম? আপনারা কাউকে কিছু না ব'লে, খবর না দিয়ে একদম ওপরে চলে এলেন? ভদ্রলোকের কি এইরূপ ব্যবহার?"

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি হাসিয়া বলিলেন,—

"আরে থাম্ থাম্—তোর আর বাহাদুরি কর্‌তে হবে না অমল: খাপ্ দে—খাপ্ দে।"

এই বলিয়া তিনি অমলবাবুর সম্মুখে একখানা চৌকিতে বসিয়া পড়িলেন। অমল এই বৃদ্ধের কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইয়া কতকক্ষণ তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পরে ঈষৎ হাস্যযুক্ত দৃষ্টিতে বলিলেন,—

"ও চিনেছি—চিনেছি। শরদ্দা যে! আজ কুড়ি বছর পরে যে তুমি এ রকম এসে Surprise visit (হঠাৎ দেখা) দেবে তা'ত স্বপ্নেও ভাবিনি। এস কোলাকুলি করি। ...তোমার চেহারাতে ত একটুও চেনবার উপায় নেই দাদা। ঐ লম্বা পাকা দাড়ি দেখে মনে হয়েছিল, কোন্ ঋষি মশায় এসে উপস্থিত হ'লেন। কিন্তু তোমার ঐ "খাপ দে' —কথাটায়ই তোমাকে ধরিয়ে দিয়েছে।"

"তুই এখনও ভুলিস্ নেই অমল? সেই যে যাত্রার দলের সং একজন আর একজন কে "চুপ কর" না ব'লে বলেছিল, 'তলোয়ার খাপ দে'— সে কথা এখনও তোর মনে আছে?"

"থাকবে না? তুমি যে সব সময় ঐ কথা ব্যবহার করতে, আর আমরা তোমাকে বাঙ্গাল ব'লে ঠাট্টা করতুম। ওটি বুঝি ছেলে? বাবাজি দাঁড়িয়ে রইলে কেন—ঐ চৌকীটায় বোস।"

শরৎবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন;—

"নলিন, তোমার কাকাবাবুকে নমস্কার কর। ঐ যে ওখানে দাঁড়িয়ে, ওটি তোমার মেয়ে নয়? মা লক্ষ্মী আমাকে দেখে লজ্জা ক'রছ কেন?"

"থাক—থাক—বাবা আশীর্ব্বাদ করছি, দীর্ঘজীবী হয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল কর। হাঁ—ওটি আমার বড় মেয়ে—মা সুনীলা, তোর জ্যেঠা মশায়কে প্রণাম করলি নে?"

সুনীলা এতক্ষণ "ন যযৌ—ন তস্থৌ" অবস্থায় একটু দূরে দাঁড়িয়ে সলজ্জ-স্মিত দৃষ্টিতে কৌতুক দেখিতেছিল। সে আসিয়া বৃদ্ধের পদধূলি লইয়া প্রণাম করিল। শরৎবাবু তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহার পিতার দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—

"তোমার বড় ছেলে কি কর্‌ছে ?"

"সে এখানে বি, এ পাশ ক'রে I. C. S. দিতে বিলেত গিয়েছে। তোমার এ ছেলেটি কি কর্‌ছে ?"

"নলিন এবার Mathematicsএ (অঙ্কে) এম্-এ পরীক্ষায় ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হয়েছে, আবার ল ক্লাসও এটেণ্ড্ (attend) করছে, উকীলের ছেলে কি না ? ওর পরীক্ষার কাগজ নাকি খুব ভাল হয়েছে, তাই দেখে স্যর আশুতোষ ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি ওকে সঙ্গে নিয়ে আজ সকালে তাঁর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তিনি ওকে ইউনিভারসিটিতে একটি চাকুরি দিতে চান। সেই পরামর্শর জন্য তোমার কাছে এসেছি।"

"তা'ত আসবেই—ওঃ কতকাল তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি শরদ্দা। তুমি এখনও আমাকে ভুলতে পারনি, তোমার সেই সাবেক উদার ভাবই আছে।"

"তোকে কি আর ভোলা যায় রে অমল ? আমরা যে আপন ভাইয়ের মতনই ছিলাম।"

"কিন্তু এতকাল ত খোঁজখবর নাও নি দাদা ?

"আরে আমি থাকি ঢাকায়, তুই থাকিস কলকাতায়। ঢাকা থেকে কলকাতায় আসা বড় ঘটে উঠে না। সর্ব্বদাই মক্‌কেলের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়।"

"খুব পসার জমিয়েছ বুঝি ? ঢের টাকা করেছ ? বেশ—বেশ।"

"তুই ত ভাই জমিদারের ছেলে—টাকার গদির ওপর ব'সে আছিস।

আমাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা রোজগার করতে হয়। তোর এ মেয়েটি ত বড় সুন্দর, ওকে পড়াচ্ছিস্ ত ?”

“হাঁ—এবার ব্রাহ্ম-বিদ্যালয়ে সেকেণ্ড্ ক্লাসে প'ড়ছে, আসছে বছর ম্যাট্রিক দেবে। এই দেখ ওর ইংরেজী লেখা।”

এই বলিয়া অমলবাবু মেয়েকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিলেন এবং তাহার কাণে কাণে কি বলিলেন। সে চলিয়া গেল। শরৎবাবু সেই খাতাখানা হাতে করিয়া দেখিয়া বলিলেন,—

“বাঃ—এত দিব্যি চমৎকার লেখা। ইংরেজীতেও ভুল নেই। এই দেখ নলিন—তোমার হাতের লেখার চেয়েও এ লেখা ভাল।”

নলিন সুনীলার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা শুনিয়া আড় নয়নে তাহার দিকে দুই একবার তাকাইয়াছিল—চারি চক্ষুর মিলন হইয়াছিল কি না কে জানে ? এখন তাহার হাতের লেখা দেখিয়া ও তাহার বাবার মন্তব্য শুনিয়া লজ্জায় মুখ নামাইল।

তাহার এই অবস্থা দেখিয়া অমলবাবু বলিলেন,—“শরদ্দা তোমার নিজের লেখাটি কেমন ছিল, একবার স্মরণ কর দেখি ? রো সাহেব তোমার Exercise দেখে একবার remark করেছিল—'hand-writing despicable' (হাতের লেখা অতি জঘন্য)”—ইহা বলিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

শরৎবাবু সেই হাসিতে যোগ দিয়া বলিলেন,—

“তোর সে কথাও মনে আছে ? হাঃ—হাঃ—হাঃ কিন্তু আমি ত আর হাকিম নই, যে হাতের লেখা খারাপ হ'লে জজদের কাছে গাল খেতে হবে। সে জন্যে, জানিস্ অমল, আজকাল কোন কোন হাকিম সেই টকাটক্ যন্ত্র কিনেছে, তাই দিয়ে লেখে। আমরা উকীল মানুষ কথা বেচে খাই—মুখের জবান সাফ হ'লেই হলো।”

এইরূপ আলাপে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেলে পর একটি চাকর আসিয়া অমলবাবুর কাণে কাণে কি বলিল। তিনি বলিলেন,—

"শরদ্দা, বাবাজীকে নিয়ে একবার ওঠো—গিন্নীর আদেশ একটু মিষ্টিমুখ করতে হবে। চল—বাবাজী।"

দুই

অমলবাবুর গৃহিণী অল্প সময়ের মধ্যে খুব পরিপাটীরূপে জলযোগের আয়োজন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বের অভ্যাস স্মরণ করিয়া শরৎ বাবু খাইতে বসিয়া অমল বাবুকে সঙ্গে টানিয়া বসাইলেন। নলিন নিতান্ত লজ্জার সহিত আস্তে আস্তে খাইতে লাগিল। গৃহিনী কপাটের আড়াল হইতে এই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সোনার চসমাধারী দাড়িগোঁফ কামান সুকুমার বালকটিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন।

শরৎ বাবু খাইতে খাইতে বলিলেন,—

"অমল তোর মনে পড়ে, তোর বিয়ের বৌভাতের নিমন্ত্রণের দিন এই ঘরটিতে বৌয়ের মুখ দেখান হয়েছিল—আর আমি বৌকে হাসাবার জন্যে একটা বাঙ্গাল কথা বলেছিলেম। তোর বৌ অমনি হেসে ফেলেছিলেন।"

অমল বাবু হাসিয়া বলিলেন,—

"তোমার বাঙ্গাল টান্ শুনে এখনও বোধ হয় তিনি কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে হাস্ছেন।"

শরৎ বাবু খাওয়া শেষ করিয়া বলিলেন,—

"বেশ—বেশ; হাসা ভাল—হাসলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। কিন্তু অমল তোকে সেই পূর্ব্বের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। মনে আছে

ত, তুই বলেছিলি আমাদের ছেলেমেয়ে হ'লে তা'দের বিয়ে দিয়ে, আমাদের যৌবন-কালের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী ক'রব ?"

এই সময়ে নলিন রুমাল দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে আস্তে আস্তে বাহিরের হলে প্রস্থান করিল। অমল বাবু এক ঢোক জল খাইয়া বলিলেন,—

"হাঁ, খুব মনে আছে।"

"এখন ত সেই সময় উপস্থিত। সেই রকম কাজ কর না কেন ? আমি ত খুব রাজী আছি।"

"কিন্তু ভাই, তোমরা হ'লে বঙ্গজ, আমরা হলুম দক্ষিণরাঢ়ী—সমাজে আট্‌কাবে যে ?"

"কেন আট্‌কাবে ? আজকাল এ রকম কত বিয়ে হচ্ছে না ? তোমাদের সারদাচরণ মিত্রই ত পথ দেখিয়েছেন। আমিও কায়স্থ-সভার একজন সভ্য—এই দেখ আমি পৈতে নিয়েছি। আমি আমার ছেলেকে দক্ষিণরাঢ়ী সমাজে বিয়ে দেব—ঠিক করেছি।"

"কিন্তু আমার গিন্নীর মত হবে কি ? আমাদের ক্রিয়াকর্ম্ম যে সব কলকাতায়। তোমরা হলে ঢাকাবাসী,—পদ্মাপারের লোক।"

"পদ্মাপারের লোক বটে, কিন্তু আমি হ'লেম মালখা-নগরের শরৎকুমার বসু, তুমি কোথাকার মিত্র জানি না—এখন কলিকাতা শ্যামপুকুরের অমলকৃষ্ণ মিত্র ; আমরা উভয়েই ত শ্রেষ্ঠ কুলীন। এরূপ সম্বন্ধে দোষ কি ? তুমি বৌমাকে একবার বুঝিয়ে বল্‌তে পার।"

"তা' অবশ্য বল্‌তে পারি, কিন্তু দাদা জান ত মেয়েরা বড় conservative (গোঁড়া)—তাঁদের মত করান শক্ত।"

"হাঁ, তোমাদের মত হবে কেন ? ছেলেকে ত বিলেত পাঠিয়েছ। শ্রীমান্ সেখান থেকে যদি এক হোটেলওয়ালী মেম বিয়ে ক'রে আনেন,

অথবা এখানে এসে মিস্ বিলাসিনী কার্‌ফর্‌মা কিম্বা মিস্ কমলিনী সাধুখাঁ গোছের এক :তাঁতির মেয়ে, কি কলুর মেয়ে বিয়ে ক'রে বসেন, তখন কি কর দেখা যাবে। বৌমা অবশ্য আমার সব কথা শুন্‌ছেন, অসন্তুষ্ট হবেন না। এখন সময় অনুসারে চল্‌তে হবে। এই ত আমার ছেলেকে দেখলেন, কি রকম লেখা পড়া করেছে তাও শুনে থাকবেন। টাঙ্গাইলের এক জমিদারের মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ উপস্থিত হয়েছে, তাঁরা গহনা দানসামগ্রী বাদে নগদ দশ হাজার টাকা দিতে চান ; আমি এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করব না। আমি কেবল একটি ভাল মেয়ে চাই। আপনাদের এই মেয়েটি দেখে খুব খুসি হয়েছি ; আমার ত খুব ইচ্ছা। আমার কথাটা একবার ভেবে দেখবেন।"

এই বলিয়া শরৎ বাবু পান চিবাইতে চিবাইতে বাহিরে আসিলেন। অমল বাবু বলিলেন,—

"শরদ্দা তোমার প্রস্তাবে আমার অমত নেই, গিন্নীকে বুঝিয়ে দেখি, তিনি কি বলেন। তুমি কোথায় নেবেছ ভাই ?"

"ছেলের হোষ্টেলে। আচ্ছা তা হ'লে ছেলে কি স্যর আশুতোষের চাকরি নেবে ? তোমার মত কি ?"

"অবিশ্যি নেবে। আশু বাবুর মত মুরব্বী পাওয়া কি সোজা কথা ? এ দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারও দেবে, আবার ল-ক্লাসে লেক্‌চারও শোন্‌বে। বুঝলে কি না ?"

"হাঁ আমারও সেই মত। তবে আমরা এখন আসি ; মধ্যে মধ্যে ছেলের খোঁজ খবর নিও ভাই, আমরা ত থাকি কোন দূরদেশে।"

"অবিশ্যি। আমার মেজ ছেলে নির্ম্মলকে মধ্যে মধ্যে পাঠিয়ে দেব। সে এবার বি, এ প'ড়ছে। একটু সবুর কর না দাদা, আমার মোটর আনতে বলি। চল—আমিও তোমাদের সঙ্গে বেরুব। একবার চৌরঙ্গীর

দিকে যেতে হবে, একটা engagement (দেখা করার অঙ্গীকার) আছে। ঐ যে—টেলিফোঁতে কে ডাকছে, শুনে আসি।” এই বলিয়া তিনি মোটর আনিতে হুকুম দিয়া টেলিফোঁর ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে কতক্ষণ আলাপ করিয়া শরৎ বাবুর নিকট আসিয়া বসিলেন।

শরৎ বাবু সেই আলাপ কিছু কিছু শুনিতে পাইয়া বলিলেন,—“ও সব কিসের আলাপ করছিলে হে? কোন businessএর (বিষয় কর্ম্মের) আলাপ বুঝি?”

“হাঁ দাদা, ইদানীং জমিদারির আয়ে আর কুলোয় না; বহু সরিক হ'য়েছে কি না। ছেলেটাকেও আবার বিলেত পাঠিয়েছি; সেজন্য সেয়ার মার্কেটে কিছু কাজ করছি।”

“ও বুঝেছি—Speculation (দালালি)—মন্দ নয়, তবে সাবধান হ'য়ে চ'লবে। আমার এক মোয়ক্কেল Speculation ক'রতে গিয়ে শেষে লাল বাতি জ্বালাতে বাধ্য হ'য়েছে; বুঝ্‌লে কি না ভায়া?”

এই সময় একটি চাকর আসিয়া বলিল, মোটর প্রস্তুত। অমল বাবু দু চার মিনিটের মধ্যে বেড়াবার পোষাক পরিয়া আসিলেন এবং সপুত্রক শরৎ বাবুকে লইয়া বাহির হইলেন।

তিন

সন্ধ্যার পরে অমল বাবু বেড়াইয়া আসিলে গৃহিণী বলিলেন,—“তোমার ঐ বন্ধুটি বেশ আমুদে লোক। ছেলেটি যেন কার্ত্তিক।”

অমল বাবু হাসিয়া বলিলেন,—

“তোমার বুঝি মনে ধ'রেছে। পড়াশুনোয় ও একটি রত্নবিশেষ। এবার এম-এ পরীক্ষায় প্রথম হ'য়েছে। এ রকম একটি ছেলে

আন্‌তে গেলে কলকাতায় দশটি হাজার টাকার কমে কিছুতেই হবে না। কথার ভাবে বোধ হ'লো টাকাকড়িও বেশ আছে।"

"কিন্তু হ'লে কি হয়—ওঁরা হলেন বঙ্গজ, আমরা দক্ষিণরাঢ়ী—এই ত মস্ত গোলের কথা। কলকেতার যত বড় বড় দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থের সঙ্গে আমাদের ক্রিয়া কর্ম্ম—তারা যে একঘরে করবে?"

"আজকাল এবিষয়ে কড়াকড়ি অনেকটা ক'মেছে। কই সারদা বাবুকে ত কেউ এক ঘরে করে নি। তোমার মতলব বোধ হ'চ্ছে, কলকাতার এক বড় জমিদারের গোবরগণেশ ছেলে আনবে, সে বিষয় হাতে পেয়ে কাপ্তেন হবে এবং এক বছরে সব ফুঁকে দেবে।"

"কেন কলকাতায় কি ভাল লেখাপড়া জানা বড়লোকের ছেলে নেই? তবে অবিশ্যি টাকা লাগ্‌বে অনেক। তোমারওত এই প্রথম কাজ। ঐ ছেলে আন্‌লে টাকা বোধ হয় কিছু নেবে না। কিন্তু ঢাকা যে বড্ড দূর—পদ্মার ওপারে। না—আমি বাঙ্গাল দেশে মেয়ের বিয়ে দেব না।"

"বাঙ্গাল বাঙ্গাল কর—বাঙ্গাল কি ঘৃণার পাত্র? দেশের যত বড় বড় মাথাওয়ালা লোক তার অধিকাংশই ত বাঙ্গাল। এদের ত নাম শুনেছ—জে-সি-বোস, এ-এম-বোস, পি-কে-রায়, কে-জি-গুপ্ত, চন্দ্রমাধব ঘোষ, সি-আর-দাস, আর কত নাম ক'রব? এঁরা সবাই বাঙ্গাল। এই স্বদেশী যুগে কোথায় পূর্ব্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের সব বাঙ্গালী মিলে মিশে এক হ'বে, আর তুমি বল বাঙ্গাল—বাঙ্গাল—"

"সে কথা ঠিক। আচ্ছা দেখা যাবে, তুমি ত আজই মেয়ের বিয়ে দিচ্ছ না।"

"না—মেয়ে আগে ম্যাট্রিক পাশ করুক, তার পরে বিয়ে হবে। আর একটা বছর সবুর ক'রতে হবে; বয়স ত সবে চৌদ্দ।"

"পাশটাস্ দিয়ে কি হবে, তবে এখন থেকে ছেলে খুঁজতে আরম্ভ কর, যতদিন ভাল সম্বন্ধ না পাওয়া যায় ততদিন ঘরে রাখতেই হবে। আমি এখন রান্নাবাড়ার কি হলো দেখি গে।"

চার

উক্ত কথোপকথনের এক বছর পরের কথা লিখিতেছি। সুনীলা পঞ্চদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া ষোড়শে পড়িয়াছে। সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। বৌবাজারের চারুকান্তি দত্ত বড় এটর্ণি—তাঁহার পুত্র কমলকান্তি বি, এ পাশ করিয়া ল পড়িতেছে। চারুবাবু এটর্ণি মানুষ, খাঁই অত্যন্ত বেশী। অমল বাবু অনেক ধ্বস্তাধস্তির পর তাঁহাকে পাঁচ হাজার টাকার গহনা ও পণ বর সজ্জায় নগদ্ সাত হাজার টাকায় রাজি করিতে পারিয়াছেন। ১৩ই শ্রাবণ বিবাহের দিন, কাল ৮ই গায়-হলুদ।

চারুবাবুর গৃহিণী আবার তাঁহার চেয়ে এক কাঠি সরেশ। তিনি এক বায়না ধরিলেন, আমার প্রথম ছেলের বিয়ে, খুব জম্‌কাল শোভাযাত্রা করিয়া যাইতে হইবে। চারুবাবু হিসাব করিয়া দেখিলেন ব্যাণ্ড, আলো, রোসনাই ইত্যাদির খরচ বাবদে আরও দুই হাজার টাকার প্রয়োজন। তিনি হিসাব করিয়া রাখিয়াছিলেন, ঐ যে নগদ সাত হাজার পাইবেন, তাহার দুই হাজার খরচ করিয়া বাকি পাঁচ হাজার ব্যাঙ্কে রাখিবেন। এখন এই শোভাযাত্রার দুই হাজার কোথা হইতে আসিবে? তিনি গৃহিণীর পরামর্শে অমল বাবুকে এই টাকার জন্য একখানা চিঠি লিখিলেন।

এদিকে সংপ্রতি কিছুদিন যাবৎ অমলবাবুকে বড় বিমর্ষ দেখা

যাইতেছে। গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, ব্যবসা বড় খারাপ চলিতেছে। আজ সকালে টেলিফোঁ দ্বারা জানিতে পারিলেন সেয়ার মার্কেটে তাঁহার দুই লক্ষ টাকা লোক্‌সান হইয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া তিনি একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। এই সময়ে বৌবাজার হইতে চারুবাবুর একজন কর্ম্মচারী তাঁহার চিঠি লইয়া আসিল। তিনি সেই চিঠি পড়িয়া উত্তেজিত হইয়া অন্দরে গৃহিণীর কাছে আসিয়া বলিলেন,—

"ওগো শুনছো— তোমার হবু বেয়াই এক চিঠি লিখেছেন। তিনি ব্যাণ্ড, রোসনাই এই সব বাবদ আরও দুই হাজার টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ আমরা যে সাত হাজার টাকা নগদ দিতে চাইছি, তা' তাঁর ব্যাঙ্কে জমা হবে, তা' বাদে তাঁর খরচ বাবদ আরও দুই হাজার টাকা দিতে হবে। তোমার হবু বেয়ান নাকি এ টাকা না দিলে ছেলের বিয়ে দেবেন না। আমি আর এসব ছোট লোকদের সঙ্গে পেরে উঠছি নে।"

গৃহিণী দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—

"কি করবে, পাকা দেখা হ'য়ে গেছে। এত টাকাই দিচ্ছ আর দু-হাজারের জন্য এই সম্বন্ধটা ছেড়ে দেবে?"

"রেখে দাও তোমার পাকা দেখা। যাদের কথার ঠিক নেই তাদের সঙ্গে পাকা আর কাঁচা কি? তা'ছাড়া আমার যে কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত তা' তোমাকে এখনও বলি নি। এখন এই সাত হাজার টাকা দেওয়াও আমার অসাধ্য। এই মাত্র খবর পেলুম জুটের সেয়ারে দুই লক্ষ টাকা লোকসান হয়েছে।"

এই বলিয়া অমল বাবু ইজিচেয়ারে হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িলেন।

গৃহিণী তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া মাথার উপরে ফ্যানের সুইচ্ খুলিয়া দিয়া পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে অমলবাবু চক্ষু মেলিয়া বলিলেন, "দেখ দুই লক্ষ টাকা লোকসান, আমি এবার সর্ব্বস্বান্ত হ'লুম। আমার ব্যাঙ্কে যা কিছু জমা ছিল সব এবার বেরিয়ে যাবে। আগে বিয়ের গয়না গড়িয়েছিলুম তাই রক্ষে। এখন নগদ ৭ হাজার বল আর ৯ হাজার বল আমাকে কর্জ্জ-ক'রে দিতে হবে। না এ সব ছোটলোকদের সঙ্গে কাজ করা আমার পোষাবে না। একবার নির্ম্মলকে ডাক ত?"

গৃহিণী তাঁহার মধ্যম পুত্র নির্ম্মলকে ডাকিলেন। নির্ম্মল কাছে আসিলে অমল বাবু বলিলেন,—

"হাঁ'রে নিমু, সেই যে ঢাকার ছেলেটি নলিনকে আর দেখেছিস্।"

"হাঁ, কালও ত তাঁকে সিনেট থেকে বেরিয়ে আস্‌তে দেখলুম।"

"তার বিয়ে হয়েছে জানিস্?"

"না হয় নি।"

"আচ্ছা, বেশ।"

এই বলিয়া অমল বাবু বৈঠকখানায় চলিয়া গেলেন এবং চারুবাবুর সেই লোকটিকে বলিলেন,—

"মশাই, চারুবাবুকে বলবেন—তাঁর এক একবার এক এক কথা। আমি তাঁর সঙ্গে কাজ ক'রব না"

সে লোকটি যেন গাছ থেকে পড়িয়া বলিল—

"সে কি বলেন মশায়? পাকা দেখা যে হ'য়ে গেছে—কাল গায়ে হলুদ।"

"তা' হোক—আমি এমন লোকের ঘরে মেয়ে দেব না।"

"তবে একটু লিখে দিন।"

"আচ্ছা দিচ্ছি।"

এই বলিয়া অমল বাবু চারুবাবুর চিঠির উত্তর লিখিয়া দিলেন। সে লোকটি প্রস্থান করিল। সেইদিন বেলা ১০ টার সময় ঢাকার উকিল মালখানগরের শরৎবাবু এক টেলিগ্রাম পাইলেন—"my daughter's marriage with your son Nalin on 13th Sravan. Come sharp,—Amal" (তোমার ছেলে নলিনের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে ১৩ই শ্রাবণ, তুমি অবিলম্বে এস)।

পাঁচ

পর দিন সকালে ৭টার সময় শরৎ বাবু অমল বাবুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি খুব স্ফুর্ত্তি করিয়া "অমল অমল" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে বৈঠকখানায় আসিয়াই বলিলেন—"কিরে অমল, এত দিনে তোর গিন্নীর বুদ্ধির গোড়ায় বুঝি জল গেল। তোর টেলিগ্রাম পেয়ে যে কি পর্য্যন্ত খুসী হয়েছি, তা' ব'লতে পারি না। আমার সব কাজ কর্ম্ম ফেলে ছুটে এসেছি।"

এই বলিয়াই অমল বাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—"কি'রে! তোকে এত বিমর্ষ দেখছি কেন ভাই? গিন্নীর সঙ্গে ঝগড়া করিস্ নাই ত?

অমলবাবু বলিলেন—"শরদ্দা তোমার warning (সাবধান করা) যদি আগে শুনতুম। আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত।"

"হাঁ—বুঝেছি সেয়ার মার্কেটে বুঝি লোকসান দিয়েছ? আমি ত আগেই বলেছিলাম, ও সব তোমার আমার কর্ম্ম নয় ভাই।

তোমার যেমন রাতারাতি মিলিওনেয়ার হ'বার চেষ্টা। যাক্, ভগবান্ যা করেন, মঙ্গলের জন্যেই করেন। তুমি ঘাব্ড়িও না। এখন বিয়ের কথা কি ?”

“বিয়ে হবে এই ১৩ই শ্রাবণ। আগে একটা সম্বন্ধ ঠিক হয়েছিল—এই বৌবাজারের চারুকান্তি দত্ত এটর্ণির ছেলের সঙ্গে। আমি পাঁচ হাজার টাকার গহনা আর সাত হাজার টাকা নগদ দিতে স্বীকার করেছিলুম। তিনি তাতেই রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু পরে আবার প্রসেসনের খরচ ব'লে আরও দু'হাজার টাকা চেয়ে পাঠালেন। আমি সে কাজ করব না বলে জবাব দিয়েছি। আমার এখন যেরূপ অবস্থা সেই সাত হাজার দেওয়াও আমার পক্ষে কষ্টকর। অনেক ভেবে চিন্তে দেখলুম তোমার প্রস্তাবে সম্মত হওয়াই আমার কর্ত্তব্য। আমার গিন্নীও মত দিয়েছেন। তিনি এখন বুঝতে পেরেছেন, এখন পশ্চিমবঙ্গ পূর্ব্ববঙ্গ বলে ভেদ ক'রলে চ'লবে না। এখন বিবাহের ক্ষেত্র যত বিস্তৃত হবে ততই এই রকম টাকার জুলুম, এই কসাই-বৃত্তি কমে আস্‌বে।”

“শুনে খুব সুখী হ'লেম, ভাই। আমার কিন্তু বাঙ্গালের গোঁ—যে কথা সেই কাজ। আমি যে তোমাকে পূর্ব্বে বলেছিলেম, আমি এক কপর্দ্দকও চাই না, আমার সেই কথাই ঠিক।”

“তবে গহনা বরসজ্জা ত নেবে, আমারও দেওয়া উচিত। আমি গহনা সব আগেই প্রস্তুত করিয়েছি।”

“না, তাও আমি চাই না। শাস্ত্রানুসারে সবস্ত্রা ও সালঙ্কারা কন্যাকে সম্প্রদান করতে হয়। তুমি সেই জন্য দুই একখানা গহনা দিতে পার। আর বরকে একটি আংটী দেবে। আমি এখনই মেয়ে আশীর্ব্বাদ করতে চাই। কিন্তু ভাল কথা,

তোমার মেয়ের ঠিকুজী কোষ্ঠী আছে? সেটা একবার দেখা দরকার।"

অমল বাবু বলিলেন—"ঠিকুজী আছে—এই আনছি"। এই বলিয়া তিনি মেয়ের ঠিকুজী আনিয়া শরৎ বাবুর হাতে দিলেন। শরৎ বাবু পকেট হইতে বরের কোষ্ঠী বাহির করিয়া মিলাইয়া দেখিলেন।

অমল বাবু বলিলেন—"তোমার এ বিদ্যাও জানা আছে দেখছি শরদ্দা।"

"হাঁ একটু একটু বুঝি বৈকি। তোমার মেয়ের কোষ্ঠীর সঙ্গে আমার ছেলের কোষ্ঠী অতি আশ্চর্য্য রকম মিলে গিয়াছে। একেবারে রাজযোটক। কেবল তাই নয়—They are intended for each other—এ বিয়ে না হয়েই যায় না।"

"শুনে খুব সুখী হলুম ভাই। বিয়ের দিন ত সেই ১৩ই শ্রাবণই ঠিক থাকবে? ভাল ক'রে কোষ্ঠী দেখে বল।"

"হাঁ ঐ দিনেই রবিশুদ্ধি, তারাশুদ্ধি আছে। ঐ দিনই ঠিক। তা' হলে পাকা দেখবার বন্দোবস্ত কর। গায়হলুদের দিন কালও আছে।"

"তাই হবে। তোমার কি একটা বাড়ী ভাড়া করতে হবে?"

'না, আমার এক খুড়তুত ভাই শিশিরবাবু হাইকোর্টের উকীল, ভবানীপুরে তাঁর বাসা, সেখানেই ছেলের গায়-হলুদ হবে। কিন্তু এক কথা, তোমাদের এদেশে গায়-হলুদ ফুলশয্যায় তত্ত্ব পাঠাতে হয়। আমরা কিন্তু সে সব তত্ত্ব ফত্ত্বর ধার ধারি না। তত্ত্ব আমিও কিছু পাঠাব না, তুমিও কিছু পাঠিও না। যেমন সাহিত্য-সম্মিলনীতে অনেক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়, "taken as read", আমাদের উভয়ের তত্ত্বও প্রেরিত বলিয়া গৃহীত হবে।"

"কিন্তু গিন্নী তাতে রাজী হবেন কি?"

"হবেন না কেন? তত্ত্ব ত কেবল "ইতরে জনাঃ" দিগের দেখ্‌বার জন্য দেওয়া হয়; লাভের মধ্যে যে লোকগুলি মাথায় ক'রে নিয়ে আসে, তাদের কতক গুলি টাকা বখসিস্ দিতে হয়। আমাদের কায়স্থ-সভার নিয়ম অনুসারে তত্ত্ব দেওয়া নেওয়া নিষেধ। আর তোমার গিন্নী যদি মন খুঁত খুঁত করেন, তবে তুমি এই ২০০৲ টাকার নোট নেও, যা কিন্‌তে হয় এই টাকা দিয়ে গায়-হলুদের সামগ্রী কিনে নিও। আমার ত এখানে বাড়ী নয়, পরের বাড়ী থেকে তত্ত্ব পাঠান অসুবিধা হবে। একথা তোমার গিন্নীকে বুঝিয়ে বল্‌বে।"

"আচ্ছা তাই হবে।" এই বলিয়া অমল বাবু অন্দরে গমন করিলেন।

ছয়

আজ ১৩ই শ্রাবণ শুভবিবাহের দিন। অমল বাবুর বাড়ী আলোক-মালায় ফুলপাতায় সুসজ্জিত হইয়াছে। সন্ধ্যা হইতেই শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট মোটর গাড়ী, জুড়ী গাড়ীতে ভরিয়া গেল। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া বিবাহ-সভায় উপস্থিত হইলেন। যথাসময়ে বরপক্ষ বর লইয়া সভাস্থ হইলেন। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ শরৎ বাবুর অমায়িকতার কথা শুনিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। শুভদৃষ্টির সময় যখন বর ক'নের চারি চক্ষুর মিলন হইল, তখন বর সেই প্রথম দিনের চারি চক্ষু মিলনের কথা স্মরণ করিয়া হাসিয়া ফেলিল; ক'নেও হাসিতে হাসিতে চক্ষু মুদ্রিত করিল। তখন বরের বন্ধুগণ হাততালি দিয়া হাসিয়া

উঠিল। অমল বাবু যথানিয়মে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বর ক'নে বাসর ঘরে গমন করিল।

নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে নানাজনে নানাপ্রকার মন্তব্যপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, অমল বাবু টাকা বাঁচাবার জন্য মেয়েটাকে পদ্মানদীতে ডুবাইয়া দিলেন। আর একজন বলিলেন,—অমল বাবুর টাকা এখন কোথায়? তিনি যে দেউলিয়া হ'য়েছেন। আবার কেহ কেহ বা তাঁহার সৎসাহসের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কায়স্থ-সভার অনেক গণ্যমান্য সভ্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় উঠিয়া কায়স্থ-সভার পক্ষ হইতে শরৎ বাবু ও অমল বাবুকে অভিনন্দন করিয়া উভয়ের গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দিলেন।

কৌলিন্যের জের

এক

কেবলরাম ঘোষ তাঁহার চৌচালা ঘরের পিঁড়ায় মাদুরের উপর বসিয় ডাবাহুঁকায় তামাক খাইতেছেন। তিনি গম্ভীরা-সমাজের "মুখ্যিকুলীন" কিন্তু তাঁহার চেহারা ও কথাবার্ত্তায় কৌলিন্যের কোন চিহ্ন দেখা যায় না।

"ঘোষ মশায় বাড়ীতে আছেন?" বাহিরে কে একজন হাঁকিল।

কেবলরাম বলিলেন—"কে তুমি? নসীরাম নাকি? ভিতরে এস।"

আগন্তুক নসীরাম ধর খালি গায়, চাদর গলায়, চটিজুতা পায়, ছাতা হাতে প্রবেশ করিয়া কেবলরামকে নমস্কার করিয়া সসম্ভ্রমে সেই মাদুরের একপাশে বসিলেন। কেবলরাম তাঁহার ধূমপান শেষ করিয়া নসীরামের হাতে হুঁকা দিয়া বলিলেন "কি নসীরাম, ভাল আছ ত? আজ কি মনে করে এসেছ?"

নসীরাম বলিলেন—"আজ্ঞে, আপনার মেয়ের একটা ভাল সম্বন্ধ নিয়ে এসেছি।"

এই বলিয়া তিনি হুঁকাটি নামাইয়া রাখিলেন।

কেবল।—কোথাকার সম্বন্ধ?

নসী।—সন্তোষপুরের তারাপদ বসুর বড় ছেলে—তিনি পঁচিশের পর্য্যার কুলীন, মাহীনগরের ঘর, "তেওজো-দোওজা"। ছেলেটি বি, এ পড়িতেছে—দেশে বিষয় সম্পত্তিও বেশ আছে, খুব সম্ভ্রান্ত লোক। আপনাকে মেয়ে "দানে" দিতে হবে।

কেবলরাম তাচ্ছিল্যের সহিত বলিলেন' "হাঁ—তা'তো বুঝিলাম। টাকা দেবে কত?"

ঘটক মহাশয় একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,—"আপনি কি তবে মেয়ে দানে দিয়া টাকা নিতে চান?"

কেবলরাম বিরক্তির স্বরে বলিলেন,—"নেবো না? আমি মুখ্যি-কুলীন, আমার মেয়ে তেওজো-দোওজার ঘরে যাবে, আমি টাকা নেবো না ত কি? আমার বাবা আমার বোনের বিয়েতে দুই হাজার টাকা পণ নিয়েছিলেন।"

নসীরাম বলিলেন,—"আজ্ঞে, সে মান্ধাতার আমলের কথা। এখন আর সেদিন নাই। তিনি হয় ত কোন পচা কায়েতের ঘরে মেয়ে দিয়াছিলেন, ইহারা ত সেরকম নয়।"

কেবলরাম কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"পচা কায়েত আবার কিসের? তোমার মত 'বাহাত্তুরে' ধর নয়—তারা সনাতনপুরের সেন, মস্ত জমিদার।"

ঘটক মহাশয় মনে মনে খুব চটিলেন, কিন্তু তাহা বাহিরে প্রকাশ না করিয়া বলিলেন,—"আজ্ঞে, আপনারা মস্ত কুলীন, আপনাদের সব শোভা পায়। কায়স্থ ত দূরের কথা, কত নীচ জাতি আপনাদের সঙ্গে কাজ করিয়া তরিয়া গিয়াছে। আচ্ছা, তা' হ'লে আপনি কত টাকা হ'লে মেয়ে দিতে পারেন?"

কেবলরাম এবার প্রসন্ন হইয়া ঈষৎ দন্তবিকাশ করিয়া বলিলেন,—"জানত, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বেগুনের ক্ষেত করিয়া গিয়াছেন, আমরা সেই বেগুন তুলি আর খাই। পলাশপুরের পালেরা সেদিন আমার মেয়ের জন্য হাজার টাকা নগত আর গা ভরা গহনা স্বীকার করিয়া গিয়াছে, আমি তাহাতে রাজি হই নাই।"

ঘটক বলিলেন "তারা যে পাল, আর এরা বসু, এরা কুলীন ! আপনি এটা বিবেচনা করিবেন না ?"

"আরে পাল হইলে কি হয় ? আমার টাকা নিয়ে কথা।"

"আজকাল অনেক নমঃশূদ্রও বেশ অবস্থাপন্ন হইয়াছে। তাহাদের মধ্যেও কতজন বি, এ, এম, এ পাশ করিয়া বড় বড় চাকুরি করিতেছে। টাকা পাইলে আপনি বোধ হয় তাহাদের সঙ্গেও কাজ করিবেন ?"

কেবলরাম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"যাও—যাও—তোমার মুখে যা আসে তাই বল। তোমাকে আমার এক আসনে বসিতে দিয়াছি কি না, তাই তোমার আস্পর্দ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে।"

নসীরামও ক্রুদ্ধ হইয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন,—"তাহাতে আপনার হুঁকার জল নষ্ট হয় নাই। আমি চলিলাম, নমস্কার।"

এই বলিয়া ঘটক মহাশয় ক্রোধভরে প্রস্থান করিলেন।

দুই

ইহার সাত দিন পরে. কেবলরাম একখানা ময়লা গামছা পরিয়া তাঁহার বাহির বাটীর প্রাঙ্গণে বসিয়া দা হাতে বাঁশের বাখারি চাছিতে-ছিলেন. এই সময়ে খুব ফিটফাট পোষাক পরা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি যুবক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরিধানে ফরাসডাঙ্গার কালো ফিতেপেড়ে ধবধবে ধুতি, তাহার উপর সাদা কামিজ ও সিল্কের কোট, গলায় সিল্কের চাদর, পায় সিল্কের মোজা ও বার্ণিস করা জুতা, দুই হাতের আঙ্গুলে চারিটি পাথর বসান সোণার আংটি, কোটের পকেটে লম্বা সোনার চেন ও ঘড়ী। বাবুটি আসিয়া কেবলরামকে বলিলেন,—

"দেখ, তুমি বুঝি এই বাড়ীর চাকর—তুমি একবার ঘোষ মশায়কে ডাকিয়া দিতে পার?"

আগন্তুকের চেহারা ও বেশভূষা দেখিয়া কেবলরামের তাক লাগিয়া গিয়াছিল। তিনি কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং সেই বাবুটিকে তাঁহার পশ্চাদ্‌গমন করিতে ইঙ্গিত করিয়া, বাড়ীর ভিতরে তাঁহার চৌচালা ঘরের বারান্দায় বসিবার জন্য মাদুর পাতিয়া দিলেন এবং নিজে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার একখানা ধুতি পরিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে বাহিরে আসিয়া সেই মাদুরের উপর বসিয়া বলিলেন,—"আমিই কেবলরাম ঘোষ, আপনি কোথা থেকে আসিয়াছেন?"

সমাগত বাবুটি তখন শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া বলিলেন—"আজ্ঞে, ঘোষ মহাশয়! আমার অপরাধ হইয়াছে। আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই। আমাকে মাপ করুন। আমার নাম শ্রীনিত্যানন্দ দত্ত, আমার নিবাস খুলনা জেলা বিদ্যানন্দপুর, এখান হইতে প্রায় ১২ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে।"

কেবলরাম বলিলেন,—"তুমি তামাক খাও?"

নিত্যা।—আজ্ঞে, আমি তামাক খাই না।

কেবলরাম হুঁকা রাখিয়া বলিলেন,—"আমার এখানে কি জন্য আসিয়াছ বল।"

নিত্যা।—"আজ্ঞে, আপনি মুখ্যি কুলীন কায়স্থসমাজের মাথার মণি। পরম্পর শুনিলাম আপনার একটি বিবাহযোগ্য কন্যা আছে, আমার ছোট ভাই সদানন্দের সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিতে চাই।"

"ছেলেটি কি করে? তোমাদের বাড়ীর অবস্থা কেমন?"

"আজ্ঞে, আমার সে ভাইটি কলিকাতা স্কটিস্‌চার্চ্চ কলেজে এবার বি, এ, পড়িতেছে, আর দুই মাস বাদেই তার পরীক্ষা। আমাদের দেশে যে বিষয় সম্পত্তি আছে তাহার বাৎসরিক আয় তিন হাজার টাকা, এতদ্ভিন্ন দুইশ বিঘা খামার জমি আছে। যদি এখন ছেলে দেখিতে চান তবে কলিকাতায় আপনার কোন আত্মীয়কে চিঠি লিখিলে সেখানে দেখিতে পারেন। সদানন্দর পরীক্ষা নিকটে, সে এখন দেশে আসিতে পারিবে না।"

"আমার এক ভাইপো কলিকাতায় পড়ে, সে ছেলে দেখিবে। তুমি অবশ্য মেয়ে দেখিতে চাও?"

"আজ্ঞে, যখন নিজে আসিয়াছি তখন একবার দেখিব বৈ কি?"

"মেয়ে কালো,—এই আমার গায়ের রঙ।"

"তা, হো'ক—বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে অধিকাংশই ত কালো। কেবল সাদা চামড়া হইলেই হয় না। কুলীনের মেয়ের রঙ দেখিবার প্রয়োজন নাই।"

এই কথা শুনিয়া কেবলরাম ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কতক্ষণ পরে লাল কস্তাপেড়ে শাড়ীপরা একটি বার বছর বয়সের ঘোর কালবর্ণ মেয়েকে লইয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন—"এই দেখ, এটি আমার মেয়ে পাঁচি -ওর একটা ভাল নামও আছে—কি যেন ছাই আমার মনে পড়ছে না। বল্ না—তোর ভাল নাম কি?"

মেয়েটি হাসিয়া বলিল—"মৃণালিনী।"

নিত্যানন্দ বলিল—"বা বেশ নাম ত। মা লক্ষ্মী, তুমি কি বই পড়?"

মেয়েটি গম্ভীরভাবে বলিল—"প্রথম ভাগ।"

"কিছু লিখিতে পার?"

"তালপাতায় ক খ লিখি।"

কেবলরাম বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"বাপু, তোমরা হালফ্যাসনের ছেলেরা কেবল লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা কর। কাজকর্ম্মের কথা কিছুই জানিতে চাও না। আমার এই এতটুকুন মেয়ে, ও সংসারের না পারে এমন কাজ নাই—রাঁধাবাড়া, ঘরলেপা, বাসনমাজা, কাঁথা সেলাই করা—সব কাজ।"

নিত্যানন্দ হাসিয়া বলিল—"বেশ—বেশ। আমিও তাই চাই। আমরাও পাড়াগেয়ে গৃহস্থ, বাড়ীতে হাল গরু আছে. চাকর বাকর খাটে. গোলাভরা ধান। আমরা ধান চাল কিনিয়া খাই না। আচ্ছা খুকী তুমি এখন যাও।"

এই কথা শুনিয়া মেয়েটি ছুট দিল। সে এতক্ষণ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে নিত্যানন্দের বেশভূষা দেখিতেছিল। নিত্যানন্দ বলিল—"ঘোষ মহাশয়, মেয়ে ত দেখিলাম, এখন কি হইলে আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিতে পারেন?"

"বাপু, তুমি কোথাকার দত্ত তা' জানি না। তোমার সদানন্দপুরের নাম—কি বলিতেছ বিষ্ণানন্দপুর?—আচ্ছা, তাই হ'ল—বিষ্ণানন্দপুরের নাম কখন শুনি নাই। তোমরা কিরকম কায়েত, তোমাদের ক্রিয়াকর্ম্ম কি রকম আছে, তাহাও জানি না। তবে দেখিতেছি তুমি একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক—পয়সা কড়িও বিলক্ষণ আছে। তুমি যদি দেড় হাজার টাকা নগত আর মেয়ের গা-ভরা গহনা দিতে পার তবে আমি মেয়ে দিতে পারি, নচেৎ না। আমার এই এক কথা।"

নিত্যানন্দ বলিল—"আজ্ঞে. আপনি যেরূপ আদেশ করিলেন আমি তাহাতেই সম্মত আছি।"

কেবলরাম বলিলেন—"বিয়ে আমার এই বাড়ীতেই হবে। কিন্তু

আমার অবস্থা ত দেখিতেছ, বিয়ের খরচপত্র দেওয়ার সাধ্য আমার নাই। সে সব খরচপত্রও তুমি দিবে। বেশী আর কি, এই পাড়ার ২।৪ জন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় নিমন্ত্রণ করিব, আর তোমরা যে কয় জন আসিবে। কিন্তু বেশী লোক আসিলে আমি জায়গা দিতে পারিব না, আমার ঘর বাড়ীর অবস্থা ত দেখিতেছ।”

নিত্যানন্দ বলিল—“আজ্ঞে, আমারও সেই ইচ্ছা। নাপিত পুরোহিত নিয়ে আমবা বড় জোর ৮।১০টি লোক আসব। আপনার কোনরূপ অসুবিধা করিতে আমরা চাই না।”

“আর বাদ্যিবাজনার দরকার নাই—সে সব বাহুল্য খরচ আমি পছন্দ করি না।”

“তা, বেশ। বাদ্যিবাজনা যা হয় আমরা দেশে গিয়া করিব। আমাদের একটু আমোদ প্রমোদ করা চাই ত। বিবাহের পরদিনই প্রত্যূষে আমরা বৌ নিয়া যাত্রা করিব। আপনাদের কুশণ্ডিকা আছে নাকি?”

“না, আমাদের সে বালাই নাই। আমরা বড় কুলীন হইলেও বামনরা আমাদের সে সব করিতে দেন না। তোমরা পরদিন বাসীবিয়ের পর সকালে যাত্রা করিও।”

“আজ্ঞে, আপনি মহৎ ব্যক্তি—কায়স্থ সমাজের মাথার মণি, আপনাকেও কৃপা করিয়া এই অধমের বাড়ীতে একবার পদধূলি দিতে হবে।”

“যদি তোমরা আমার উপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষা কর তবে সে আর বেশী কথা কি? তোমরা আমাদের বেগুনের ক্ষেত, আমরা সেই বেগুন তুলি আর খাই, বুঝিলে কি না?”

“আজ্ঞে, খুব বুঝিয়াছি। আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তির মর্য্যাদা আমরা খুব বুঝি।”

"বিবাহের দিন কখন করিতে চাও? পত্রাপত্রি কবে হবে? পত্র করিবার সময় আমরা "পত্র-লকুতা" বলিয়া কিছু পাইয়া থাকি, তাহা জান ত?"

"আজ্ঞে, তা জানি। বৈশাখ মাসের শেষে বিবাহের দিন করিতে হইবে। আমি শীঘ্রই আসিয়া পত্র করিয়া যাইব। সে সময় পত্র-লকুতাও পাইবেন। তবে এখন আমি আসি।"

এই বলিয়া ঘোষ মহাশয়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া নিত্যানন্দ বিদায় হইল।

তিন

২৬শে বৈশাখ বিবাহের দিন ধার্য্য হইল। কেবলরাম পণের দেড় হাজার টাকা সিন্দুকে পুরিলেন। বেশী টাকা খরচ হওয়ার ভয়ে মাত্র চারি পাঁচ জন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে তিনি নিমন্ত্রণ করিলেন। বরপক্ষও তাহাদের প্রতিশ্রুতি অনুসারে মাত্র দশটি লোক লইয়া আসিল। বাদ্যবাজনার কোন গণ্ডগোল হইল না, কেবল শাঁখ বাজাইয়া বিবাহ সম্পন্ন হইল। বরপক্ষের পুরোহিত বরের গোত্র ও প্রবর সম্বন্ধে নিতান্ত অমার্জ্জনীয় অজ্ঞতা প্রকাশ করায় সকলের উপহাসাস্পদ হইলেন। কন্যাপক্ষের পুরোহিত তাঁহার ভুল সংশোধন করিয়া দিলেন। বিবাহান্তে বরপক্ষীয় লোক ও নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা এক বৈঠকে বসিয়া লুচি তরকারি দধি সন্দেশাদি দ্বারা পরিতৃপ্তির সহিত 'ফলার' করিলেন। নিত্যানন্দ সন্তুষ্টচিত্তে সে ব্যয় বহন করিলেন। সকলে তাঁহার নানাবিষয়ে সৌজন্য ও উদারতা দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বরটি দেখিতে তাহার বড় ভাইয়ের মতন—বেশ সুপুরুষ।

কন্যার রূপ দেখিয়া তাহার মুখটা যেন নিতান্ত অপ্রসন্ন বোধ হইল। কিন্তু উপায় কি, বড় কুলীনের মেয়ে দ্বারা তাহার যে চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার হইবে।

পরদিন প্রভাতে বরকর্ত্তা বরবধূ লইয়া নৌকায় স্বগৃহে যাত্রা করিলেন। কেবলরাম ঘোষও মোটারকম কুলমর্য্যাদা পাওয়ার প্রত্যাশায় সেই সঙ্গে চলিলেন। তাঁহার একটি ছোট ছেলেও সঙ্গে গেল।

তিন দিন পরে তিনি পুত্রকন্যাসহ স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন। তখন তাঁহার মুখ ঘোর অন্ধকার। তিনি তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা রাঘবরাম ঘোষকে ঘরের মধ্যে ডাকিয়া আনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"দাদা, সর্ব্বনাশ হয়েছে! আমাদের জাত গিয়াছে।"

রাঘব উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন—"সে কি কথা? তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমরা মুখ্যি কুলীন, আমাদের আবার জাত মারে কে?"

তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কেবলরাম ভূমিতে পড়িয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী, বড় ছেলে, একটি কলেজে-পড়া ভাইপো সতীশ প্রভৃতি আসিয়া দাঁড়াইল। সকলের মুখেই ঐ এক কথা--"কি হয়েছে?"

ঘোষ মহাশয় এবার উঠিয়া বসিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন—"হবে আর কি, আমার মাথা আর মুণ্ডু! অবশেষে আমার দ্বারা এই ঘোষবংশের মুখে চুনকালী পড়িল! যার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়াছি, সে শালার বেটা কায়েত নয়, নমঃশূদ্র—অর্থাৎ চাঁড়াল! তোমরা সকলে এখন আমার মাথায় বাড়ি দিয়া আমাকে খুন কর।"

এই কথা শুনিয়া সকলে হতভম্ব হইয়া রহিলেন। অবশেষে ঘোষ-গৃহিণী কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—"হায়, হায়! পাঁচি, তোর কপালে এই ছিল! তোমার যেমন ভাব হয়েছে, তুমি টাকার

লোভে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হও। লোকে মেয়ের বিয়ে দিতে হইলে ঘর-বর খোঁজ করে, তুমি সে সব কিছুই দেখিলে না।"

ঘোষ মহাশয় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"কেন, আমি ত সতীশকে কলিকাতায় ছেলে দেখিতে লিখিয়াছিলাম। সে ছেলে দেখিয়া পছন্দ করিয়া চিঠি লিখিল, তবেই না আমি পত্রাপত্রি করিলাম। আর সেই বরের ভাই শালার বেটা কেমন সাজগোজ করিয়া ভদ্রলোক সাজিয়া আসিয়াছিল, তা'ত তুমিও দেখিয়াছিলে, গিন্নী। এখন কেবল আমার দোষ দিলে চলিবে কেন? সে আসিয়া বলিল—"আমরা দত্ত"—

রাঘব ঘোষ বলিলেন—"দত্ত ত কত জাতির মধ্যে আছে। কায়স্থ, বৈদ্য, বারুই, সোনারবেনে—এই রকম কত দত্ত আছে। সে যে কায়স্থ তা তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?"

"না, তা করি নাই। কায়স্থ না হ'লে আমার বাড়ী আসিবে কেন? বেটা হারামজাদা জুয়াচোর—আমার যে এরকম সর্ব্বনাশ করিবে তা' ত স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

রাঘব ঘোষ বলিলেন—"কেবল কি তোমার সর্ব্বনাশ, আমাদের সকলের সর্ব্বনাশ!"

কেবলরামের সেই কলেজে পড়া ভাইপো সতীশ বলিল—"কি জুয়াচুরি! শালা নমঃশূদ্র কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়। কলিকাতার মেসেও সে কায়স্থ বলিয়া পরিচিত। আমি কি করিব, জ্যেঠা মশায়? শালাকে জেলে দেওয়া উচিত। আজই চলুন জ্যেঠা মশায়, শালার নামে ফৌজদারি কোর্টে Cheating Case (প্রতারণার মোকদ্দমা) করি।"

রাঘব ঘোষ বলিলেন—"চুপ, চুপ, সে কথা মুখেও আনিস্ না। তা' হলে খবরের কাগজে উঠিবে, আর আমাদের কোন সমাজে মুখ দেখাবার সাধ্য থাকিবে না। কলিকাতার শোভাবাজারের রাজারা, হাটখোলার

দত্তরা, সিমলার মিত্তিররা—এই সব কত বড়লোক আমাদের কুটুম্ব, তাদের কাছে কি করিয়া মুখ দেখাইব ?”

এই সময়ে সেই নসীরাম ঘটক আস্তে আস্তে ঘরের বারান্দায় আসিয়া বলিলেন—“নমস্কার ঘোষ মশায়! যে সকল কলিকাতার বড়লোকের নাম করিলেন, তাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করার মুস্কিলও আছে। দারোয়ানকে ঘুস না দিলে তাদের বাড়ীর ভিতরে ঢুকিতে পারেন না। এই যে বিদ্যানন্দপুরের দত্তরা—এরা আপনাদিগকে মাথায় করিয়া রাখিবে। কেবলরাম ঘোষ মশায় এবার যাওয়া মাত্র ১০০৲ টাকা কুলমর্য্যদা পাইয়া আসিয়াছেন। আমি সব খবর রাখি। চাই কি বছর বছর নৌকা ভরিয়া ধান আনিতে পারিবেন। শালা নমঃশূদ্র, মুখ্যিকুলিনের সঙ্গে কাজ করিয়াছে, দেবে না কেন? আমি ধান আদায় করিয়া দিব।”

কেবলরাম সজল নয়নে বলিলেন—”নসীরাম, তা’ হলে এ বুঝি তোমারই কারসাজি!”

নসীরাম জিব কাটিয়া বলিলেন—“আজ্ঞে না, ঘোষ মশায়! আমি বাহাত্তুরে কায়েত, ছোটলোক, আমার ক্ষমতাই বা কতটুকু? তবে একদিন খুলনায় কথায় কথায় নিত্যানন্দকে বলিয়াছিলাম, আপনি মস্ত মুখ্যিকুলিন, আমাদের মাথার মুকুট। কেন, আমি কি সে কথা মিথ্যা বলিয়াছিলাম?”

রাঘব ঘোষ বলিলেন—“তা’ ত যথার্থ কথাই বলিয়াছিলে। আমাদের মুখে যথেষ্ট চূণকালী দিয়াছ, এখন আর যাহাতে বেশী দূর জানাজানি না হয় তাই করা উচিত।”

ঘটক বলিলেন—“তা’ ত অবশ্যই করিতে হইবে। কাল আবার আমার বাঘুটিয়ায় ঘোষেদের বাড়ীতে একটা বড় বিবাহে নিমন্ত্রণ আছে। তা’ সেখানে কেউ এ কথা যাহাতে না শুনে আমি তা’ অবশ্য করিব।”

রাঘব ঘোষ বলিলেন—"ঘটক' তুমি তামাক খাও।" এই বলিয়া তিনি ঘটকের হাতে হুঁকা দিয়া কেবলরামকে নিভৃতে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন—"ভায়া, এই ঘটক বেটাই যত অনর্থের মূল। এখন ওর মুখ বন্ধ না করিলে চলিবে না। ওকে কিছু টাকা দেওয়া দরকার।"

কেবলরাম কাতরকণ্ঠে বলিলেন,—"দাদা, তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর। কত টাকা দিতে হবে?"

"কিছু বেশী টাকা না দিলে চলিবে না—ও হারামজাদা ভারি বজ্জাত, দুইশ টাকা বাহির কর।"

পরে রাঘব ঘোষ ঘটককে গোপনে ডাকিয়া আনিয়া তাহার হাতে ২০০৲ টাকা দিয়া বলিলেন—"ভাই আমাদের জাতকুলমান রক্ষা কর। এ বিষয়ে যেন আর জানাজানি না হয়।"

ঘটক সুযোগ বুঝিয়া বলিলেন—"ঘোষ মশায়, এ ত দুইশ টাকার কর্ম্ম নয়—আমি একলাই যেন চুপ করিয়া রহিলাম, কিন্তু আরও কত লোকের মুখ বন্ধ করিতে হইবে।"

অবশেষে ঘটক ৫০০৲ টাকা গ্রহণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বারান্দায় মাদুরের উপর বসিয়া বলিলেন—"আপনারা মস্ত মুখ্যি-কুলীন—জন্মমুখ্যি অর্থাৎ আসল জাতসাপ, আপনাদের জাত মারে ভূভারতে এমন কোন শালা আছে? আগুন যেমন সর্ব্বভুক, কিছুতেই অপবিত্র হয় না, আপনারা সেইরূপ এসব নিম্ন জাতিকে হজম করিয়া ফেলিতে পারেন। আপনাদের এই নূতন কুটুম্বরা অবশ্য নমঃশূদ্র, কিন্তু আজকাল এই সকল অবনত জাতিকে সমাজে তোলাই ত কর্ত্তব্য। নচেৎ হিন্দু সংঘোটন কিরূপে হইবে? আপনারা সকলে বলুন—"জয় কৌলীন্যের জয়! জয় হিন্দু সংঘোটনের জয়!"

কারাগারে কোমলতা

এক

করিমপুর জেলার সদর জেলখানার উত্তরদিকে জেলের বাগান। সেই বাগানে অনেক কলাগাছ, পেঁপে গাছ, বেল গাছ ইত্যাদি গাছ আছে এবং নানাপ্রকার তরি তরকারির চাষ হয়। এই বাগানের মধ্য দিয়া উত্তরে জেলের ইটখোলায় যাইতে হয়। অনেক কয়েদী ইটখোলায় কাজ করে ও ইট প্রস্তুত করিয়া "থামাল" সাজায় এবং পাঁজা দেয়। ইটখোলা হইতে অল্পদূরে কয়েক ঘর মুসলমান কৃষকের বাড়ী।

মেহের খাঁ কয়েদী একটা হাঙ্গামা মোকর্দ্দমায় দু বৎসরের জন্য জেল খাটিতেছে, তাহার দেড় বৎসর অতীত হইয়াছে। সে একদিন প্রাতঃকালে ইট সাজাইতেছে, এরূপ সময়ে একটি ছাগলের বাচ্চা লাফাইতে লাফাইতে তাহার কাছে আসিল। তাহার পিছনে নাচিতে নাচিতে একটি মুসলমান বালক আসিয়া দূরে দাঁড়াইয়া ছাগ শিশুকে দেখিতে লাগিল। কয়েদীর কাছে আসিয়া তাহাকে ধরিবার সাহস হইল না। মেহের ছেলেটিকে দেখিয়া কাছে ডাকিল, সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া ছাগল ধরিবার লোভে নিকটে আসিয়া কয়েদীর দিকে এক চক্ষু স্থাপন করিয়া দাঁড়াইল। তাহার ধারণা ছিল, জেলের কয়েদী সব ডাকাত, খুনী, তাহাদের কাছে যাইতে নাই! কিন্তু মেহেরের হাসিখুসী ভাব দেখিয়া তাহার সাহস হইল। নিকটে আর কোন কয়েদী বা ওয়ার্ডার ছিল না। মেহের তাহাকে বলিল—

"পোলা, তোমার নাম কি ?"

সে বলিল—"রমজান।"

এই নাম শুনিয়া মেহেরের চক্ষু সজল হইল। তাহার এই রকম সাত বৎসরের একটি ছেলে আছে,—তাহার নামও রমজান। প্রথম দর্শনেই মেহেরের তাহার উপর স্নেহ হইল। সে তাহাকে আরও নিকটে আসিতে বলিল, এবং সে আসিলে তাহাকে কোলে করিয়া সেই ইটের খামালের আড়ালে বসিল। ছাগলটিকে সেখানেই ধরিয়াছিল, রমজান ছাগল পাইয়া খুসী হইল। এই সময়ে কাজ বন্ধ করিবার ঘণ্টা পড়িল। মেহের রমজানকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল—"ঐ ত তোমাগো বারী—কাল আবার আইস।" শিশুটি ছাগ-শিশু লইয়া দৌড়াইয়া গেল।

দুই

পরদিন সকালে কাজ করিতে আসিয়া মেহেরের চক্ষু ঐ কৃষক পল্লীর দিকে, সেই বালকটিকে খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইল না। সে ইট গড়িতে গড়িতে কাজ বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকে, আর তাহার বাড়ীর রমজানের কথা ভাবে। সে তাহাকে কতদিন দেখে নাই—এই দেড় বছরে সে কত বড়টি হইয়াছে—সেও কি এই রকম ছাগল লইয়া খেলা করিতে ভালবাসে—ইত্যাদি। সে কতক্ষণে দেখিতে পাইল রমজান এদিকে আসিতেছিল, কিন্তু একটি স্ত্রীলোক—সম্ভবতঃ রমজানের মা, তাহাকে কি বলিয়া ফিরাইয়া লইয়া গেল। মেহেরের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল ; ঠিক এই সময়ে সে ওয়ার্ডারের হুঙ্কার শুনিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার রক্তচক্ষু মেহেরের দিকে কটমট করিয়া তাকাইয়া আছে—"বৈঠে

বৈঠে ক্যা করতা হ্যায় শালা। কাম করো।" মেহের অমনি ভীত হইয়া ইটের ফর্ম্মা লইয়া বসিল।

ইহার পরের দিন আবার মেহের সেখানে কাজে আসিল। আজ তাহার সুপ্রভাত। সে কাজ করিতে আরম্ভ করিয়া দেখিল, রমজান ধীরে ধীরে তাহার দিকে আসিতেছে। মেহের তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাক দিল, এবং সে কাছে আসিলে ইটের খামালের আড়ালে তাহাকে কোলে করিয়া তাহার মুখে চুমা খাইয়া বলিল—

"বাপজান, তুই কাইল আসোস্ নাই ক্যানরে?"

রমজান বলিল—"কাল আস্‌তেছিলাম, মা আসবার দিল না। এখানে একজন সেপাই দাঁড়ায়ে ছিল যে।"

মেহের সজল নয়নে বলিল—"ঠিক কথা। না আইয়া ভালো করছোস্। কাল আবার আস্‌পি তো? তোরে কেলা খাইতে দিমু।"

রমজান "আস্‌ব" বলিয়া এক ছুট দিয়া চলিয়া গেল।

তিন

পরদিন প্রাতঃকালে মেহের ইটখোলায় যাইবার সময় কলা বাগানের মধ্যে প্রস্রাব করিবার ছল করিয়া বসিয়া রহিল, এবং অন্য কয়েদীগণ ওয়ার্ডারের সঙ্গে অগ্রসর হইলে, সে উঠিয়া একটা কলাগাছ হইতে কয়েকটা পাকা কলা ছিঁড়িয়া তাহার কাপড়ের মধ্যে লুকাইল। পূর্ব্বদিন সে লক্ষ্য করিয়াছিল এই কলাগুলি একটু লাল হইয়াছে, সেজন্য রমজানকে কলা দিবে বলিয়াছিল।

সে ইটখোলায় গিয়া এই কলা কয়টি ইটের তলে লুকাইয়া রাখিল এবং রমজানের আসিবার অপেক্ষায় পথপানে চাহিয়া রহিল। প্রায় একঘণ্টা

পরে রমজান এদিক ওদিক তাকাইয়া যখন দেখিল, ওয়ার্ডার অনেক দূরে আছে, তখন সে এক দৌড়ে মেহেরের নিকটে আসিয়া তাহার কোলে বসিল। মেহের হাসিমুখে তাহার মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে সেই কলা খাইতে দিল। রমজান সেখানে বসিয়া কলা কয়টি খাইয়া আবার একদৌড়ে চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, সে কাল আবার আসিবে। তাহার কলা খাইয়া লোভ বাড়িয়াছে।

চার

ঐ দিন বেলা বারটার সময় জেলার বাবু আফিস হইতে বাসায় গিয়া স্নানান্তে যখন ভাত খাইতে বসিলেন, তখন তাঁহার গৃহিণী সম্মুখে ভাতের থালা দিয়া বলিলেন,—

"তুমি যে সব জিনিষ বাসায় পাঠাও, পথে তার অর্দ্ধেক চুরি যায়।"

জেলার বাবু একগ্রাস ভাত মুখে দিয়া বলিলেন—"সে কেমন? বাঘের ঘরে ঘোঁগের বাসা? আমার পাঠানো জিনিষ চুরি গিয়াছে? কি জিনিষ বল ত?"

"আজ যে জেলখানার বাগান থেকে এক কাঁদি মর্ত্তমান কলা এসেছে তার গোড়ার ভাল চারটা কলা নেই।"

"বটে, এ নিশ্চয়ই যে ব্যাটা কয়েদী এনেছিল তার কাজ! আমি তাকে কলা খাওয়ার মজা দেখাচ্ছি।"

বোধ হয় সকলেই জানেন জেলখানার বাগানের ভাল ভাল জিনিষই জেলখানার বাবুদের (কখন কখন জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের) উপভোগ্য। কয়েদিরা খায় কেবল খোসাভুষি। জেলার বাবু যে

কয়েদীর কথা বলিলেন সে তাঁহার বাড়ীতে পালাক্রমে বেগার খাটিতে আসিয়াছিল, তাহা বে-আইনী নহে।

জেলার বাবু বৈকালিক নিদ্রার পর জেল আফিসে যাইয়া প্রথমেই সেই কয়েদিকে তলব করিলেন। সে বলিল অন্য কয়েদী যখন তাহার হাতে ঐ কলার কাঁদি দিয়াছিল, তখন ঐ কয়টি কলা তাহার মধ্যে ছিল না। সে এই কথা সেই কয়েদী দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিল। তখন যে কয়েদী গাছ হইতে কলা কাটিয়াছিল তাহার তলব হইল। সে আসিয়া বলিল—"হুজুর, আমি যখন কলা কাটি তখন ওয়াটার সাহেব আমার কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি জানেন ঐ কয়টা কলা ছিল না।" ওয়াটার সাহেব আসিয়া তাহাকে সমর্থন করিলেন। তখন খোঁজ—খোঁজ—খোঁজ—কে জেলার ও তস্য গৃহিণী-ভোগ্য সুপক্ক রম্ভা চুরি করিল। হেড ওয়ার্ডার অনেক লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ইটখোলার এক কয়েদিকে হাজির করিল। সে বলিল ইটখোলা হইতে আসিবার সময় সে আজ মেহের যেখানে কাজ করে সেখানে পাকাকলার খোসা দেখিয়া আসিয়াছে। জেলার তখন সেই কয়েদী ও মেহেরকে সঙ্গে করিয়া স্বয়ং ইটখোলায় তদন্ত করিতে গেলেন। সেখানে গিয়া প্রকৃতই পাকাকলার খোসা দেখিতে পাইলেন, এবং রক্ত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মেহেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুই বাগানের পাকা কলা চুরি করিয়া খাইয়াছিস্ ?"

মেহের বলিল—"হুজুর আমি কলা খাই নাই।"

"তবে এখানে কলা আনিয়া কে খাইল ?"

মেহের কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। তখন সেই ইট-খোলার ওয়ার্ডার প্রমাণ করিল, সেদিন সকালে ইটখোলায় আসিবার সময় মেহের প্রস্রাব করিবার ছল করিয়া সকলের পেছনে দেরী করিয়াছিল।

এই সকল অবস্থা ঘটিত প্রমাণ দ্বারা জেলার বাবু সাব্যস্থ করিলেন, মেহেরই কলা চুরি করিয়া খাইয়াছে। জেল সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট্ পরদিন বেলা ৯টার সময় মেহেরের বিচার করিয়া দণ্ড দিবেন।

পাঁচ

পরদিন বেলা নয়টার সময় জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কুলহেড্ সাহেব জেল পরিদর্শনে আসিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া দ্বার রক্ষক ঘণ্টায় বাড়ি মারিয়া সকলকে হুসিয়ার করিয়া দিল। ওয়ার্ডারগণ তাঁহাকে সারিবন্দী হইয়া দাঁড়াইয়া সম্ভাষণ (Salute) করিল। তিনি জেলখানায় ঢুকিয়াই আফিস ঘরে অধিষ্ঠান করিলেন। তখন জেলার ও নায়েব জেলার তাঁহাকে সেলাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে প্রয়োজনীয় কাগজ ও খাতাপত্র হুকুমের জন্য পেশ করিলেন। তিনি সেগুলি দেখিয়া যথাযোগ্য হুকুম দেওয়ার পর অপরাধী কয়েদীদিগের বিচার আরম্ভ হইল।

১নং অপরাধী—তেলের কল ঘুরায়। তাহার তেলের পরিমাণ কম হইয়াছে (Short work)—প্রথম অপরাধ বলিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া (warning) দেওয়া হইল।

২নং অপরাধীর নিকট তামাক পাওয়া গিয়াছে। হুকুম হইল তাহার mark (নম্বর) কাটা যাইবে।

৩নং অপরাধী—অন্য কয়েদিকে রাগ করিয়া চড় মারিয়াছিল। উভয়ের কৈফিয়ৎ ও প্রমাণাদি লইয়া সাহেব হুকুম দিলেন, অপরাধীকে তিন দিন পায়ে বেড়ি পরিয়া কাজ করিতে হইবে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর অপরাধী মেহের খাঁর তলব হইল। জেলার তাহার কলা চুরি করার প্রমাণ উপস্থিত করিলেন। তখন সাহেব তাহার জবাব কি জিজ্ঞাসা করিলেন—

"টুমি কেলা চুরি করিয়া খাইয়াছে ?"

মেহের।—"হুজুর, আমি চারিটা পাকা কেলা গাছথন ছিরছিলাম, খাই নাই।"

"টুমি খায় নাই ?"

"না, হুজুর।"

জেলার বলিলেন—"মিথ্যা কথা—সেখানে কলার খোসা আমি নিজে দেখিয়াছি, আর সকলেও দেখিয়াছে।"

"ব্যস্—টোমার ডস্ বেত হোবে।"

মেহের অমনি তাঁহাকে সেলাম করিল।

সাহেব জেলারের Suggestion (পরামর্শ) অনুসারে এই হুকুম দিয়া মেহেরের রেকর্ড ভাল করিয়া দেখিতেছিলেন,—সে পূর্ব্বে কখনও সাজা পায় নাই, বরং এই দেড় বৎসরের মধ্যে ভাল কাজ করিয়া যথেষ্ট good mark (ভাল নম্বর) পাইয়াছে, সেজন্য তাহার সাজাও কমিয়াছে। আবার এখনও সে সোজাসুজি কলা চুরি স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু খাওয়া স্বীকার করিল না কেন? তাঁহার মনে খট্‌কা হওয়ায় তিনি জেলারকে বলিলেন, ইহার বেতের হুকুম না দিয়া তিনি ইহাকে গম ভাঙ্গিবার কাজে বদলী করিতে চান। জেলার মেহেরকে সাহেবের কথা বুঝাইয়া বলিলেন—

"দেখ তোমার উপর সাহেব দয়া করিয়া দশ বেতের হুকুম রহিত করিয়া জেলখানার ভিতরে গম ভাঙ্গার কাজে দিতে চান।"

মেহের জোড় হাতে বলিল —"হুজুর, আমার ব্যাতের সাজা বহাল থাক, আমারে বদলী করবেন না। ইটখোলায়ই আমার থাকোনের ইচ্ছা।"

সাহেব কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"টোমার ইটখোলামে কি আছে? টুমি হুয়া বইঠে বইঠে কেলা খাইবেন?"

"হুজুর, ধর্ম্ম অবতার, আমি কেলা খাই নাই। আমারে ব্যাতের হুকুম দ্যান্, ইটখোলাতন বদলী করবেন না।"

"টবে কেলা কে খাইয়াছেন, বলিটে পার? সাচ্চা বাট্ বোলো।"

"হুজুর! আপনি যখন বারে বারে জিগাইতেছেন, তখন না কইয়া পারি না। ও কেলা আমি খাই নাই--আমি গাছের থন ছির‍্যা নিয়া একগো পোলারে খাওনের জন্য দিছিলাম। তার নাম রমজান—ঐ ইটখোলার উত্তরে তারগো বারি। সেই ছেমরা কেলা খাইছিল।"

সাহেব একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"টুমি সেই লেড়কার ওয়াস্তে কেলা চুরি করিয়া বেট খাইটে কেন ইচ্ছা করিয়াছ?"

এই কথায় মেহের কাঁদিয়া ফেলিল। সে বলিল—"হুজুর, আমার বেয়াদপি মাপ করবেন। হুজুরের সাদি হয় নাই, পোলার মায়া কি ট্যার পান নাই। সেই রমজানের মত আমার একগো পোলা বারিতে আছে। আজ দ্যাড় বছর তারে দেখি নাই। ঐ রমজান একদিন এট্টা ছাগলের বাচ্চার পাছে পাছে আমার কাছে আইছিল। তারে দেখ্যা আমার পোলার কথা মনে পরল। তারে আর একদিন আইতে কইয়া তার খাওনের জন্য কেলা নিছিলাম। এই আমার অপরাধ।"

"টুমি ইটখোলা ছাড়িতে চাও না কেন?"

হুজুর, ইটখোলাতন বদলী হইলে সেই ছেমরাডারে দেখতে পারমু না। সেইজন্য ইটখোলায় থাকোনের ইচ্ছা। হুজুর, দোহাই আপনার, আমারে ইটখোলায় রাখ্যা ব্যাতের হুকুম দ্যান্।”

মেহেরের এই কাতরোক্তি শুনিয়া সাহেবের চোখে জল আসিল। তিনি রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিয়া বলিলেন—

“আচ্ছা, আমি টোমার কসুর মাপ করিলাম। Jailor, I excuse him. Bring up another. (জেলার, আমি উহার অপরাধ মাপ করিলাম। আর একজনকে আন।)

মেহের সাহেবকে সেলাম করিয়া সজল নয়নে সরিয়া গেল।

আমিনা বিবির আত্ম-কথা

একটি ক্ষুদ্র নদীর তীরে একখানা বাড়ী, তাহার চারিদিকে আম-কাঁঠালের বাগান। বাড়ীতে চারি ভিটায় চারিখানি খড়ের ঘর ও মধ্যে উঠান। ইহা একজন মুসলমান কৃষকের বাড়ী হইলেও, সাধারণ কৃষকের বাড়ী অপেক্ষা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। চালা-ঘরের মাটীর দাওয়াগুলি উত্তম-রূপে নিকান। উঠানটিতে একটুও আবর্জ্জনা নাই, যেন ঝকঝক্ করিতেছে।

আমি একদিন কার্য্যোপলক্ষে অন্য গ্রামে গিয়াছিলাম। বেলা অনুমান ৩টার সময় নদী পার হইয়া ঘাটের নিকটে একটা বটগাছের ছায়ায় বিশ্রাম করিবার জন্য বসিলাম। সেই ঘাটের পশ্চিমেই ঐ কৃষকের বাড়ী। দেখিলাম, একটি স্ত্রীলোক কলসী কাঁথে করিয়া নদীতে জল আনিতে যাইতেছে। আমি দেখিয়া অবাক্ হইলাম, এরূপ তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণা রমণী ঐ গরিব কৃষকের গৃহে কোথা হইতে আসিল? তাহার চেহারা দেখিয়া তাহাকে ভদ্রঘরের হিন্দু-রমণী বলিয়া বোধ হইল। বয়স প্রায় ৩০ হইবে, বেশী লজ্জা-সরমের ধার ধারে না। সে জল লইয়া ফিরিবার সময় আমার ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টি তাহার প্রতি নিবদ্ধ আছে দেখিয়া কাছে আসিয়া বলিল,—

"আপনি কোথায় যাবেন? আপনার নাম কি?" আমি দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলাম,—"আমার নাম রসিকলাল সেন, আমার বাড়ী নিশ্চিন্তপুর, আমি ঐ সদরপুর গিয়াছিলাম, এখন বাড়ী ফিরিতেছি। ও বাড়ী কার?" "ও বাড়ী তোরাপ ফকিরের। ফকির মারা গিয়াছে।

আমি এখন দুইটি ছেলে নিয়ে ওখানে থাকি। আপনি তামাক খাবেন? আসুন, ঐ বাহিরের ঘরে বসিবেন।”

আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। বাহিরের ঘরে একটা মোড়া ছিল ও তামাক খাওয়ার সরঞ্জাম—হুঁকা, কল্‌কে প্রভৃতি ছিল। স্ত্রীলোকটি আমাকে সেখানে বসিতে বলিয়া জলের কলসী রাখিতে অন্দরে গেল, এবং একটা মালসায় আগুন লইয়া আসিয়া আমাকে তামাক সাজিয়া খাইতে বলিল।

আমি তামাক সাজিতে বসিয়া গেলাম। সে বলিল—“আমার ছেলে দুইটি স্কুলে গিয়াছে, বড়টির বয়স দশ বৎসর, ছোটটির বয়স সাত বৎসর। এ বাড়ীতে আমার এক বুড়া সতীন আছে, তার বড় ব্যারাম, ঐ ঘরে শোওয়া।”

আমি তামাক খাইতে আরম্ভ করিয়া বলিলাম,—“তোমার চেহারা দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া তোমাকে হিন্দুর মেয়ে বলিয়া বোধ হইতেছে। তোরাপ ফকিরের সঙ্গে তোমার কিরূপে বিয়ে হ’লো? যদি কোন বাধা না থাকে, তবে আমাকে বল।”

সে কিছু দূরে অন্দরের দিকের দরজায় বসিয়া বলিল,—

“আমার সেই দুঃখের কথা যখন আপনি শুনিতে চাহিতেছেন, তখন আমার বলবার কোন বাধা নাই। দেশশুদ্ধ লোক যাহা শুনিয়াছিল, যাহা লইয়া এক সময়ে মস্ত একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল, সে কথা আপনাকে বলিব না কেন? আমি যথার্থই হিন্দুর মেয়ে, এক সময়ে হিন্দুর বৌ ছিলাম। হিন্দুর রক্ত এখনও আমার শরীরের মধ্যে আছে, তাই কোন হিন্দু ভদ্রলোক দেখিলে যাচিয়া কথা কহিতে ইচ্ছা করে। আপনার কলিকার আগুনটা ধরিল না বুঝি—দেন কলিকাটা আমার হাতে, আমি ফুঁ দিয়া দিই।”

আমি বলিলাম—"না— এই আগুন ধরেছে—কলিকায় তামাক খাওয়া ত অভ্যাস নাই—"

"কি করিব—এখানে যে হুঁকা আছে তা' আপনাকে দিতে পারিব না। আচ্ছা, একটু কলার পাতা আনিয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া সে উঠিয়া একটুক্‌রা কলার পাতা আনিয়া একটা ঠোঙ্গা করিয়া দিল। আমি তাহার মধ্যে কলিকা বসাইয়া তামাক খাইতে লাগিলাম। তখন সে আবার বলিতে লাগিল—

"আমার বাপের বাড়ী ছিল লক্ষ্মীকান্তপুর গ্রামে, আমার বিবাহ হইয়াছিল সনাতনপুর ঘোষেদের বাড়ী। আমার নাম ছিল মৃন্ময়ী, ডাক নাম মিনী,—তাহা হইতে হইয়াছে আমিনা। আমার বয়স যখন এগার বছর, তখন আমার বাবা মারা যান,—আমার মা আগেই স্বর্গে গিয়াছিলেন। তখন আমার কাকা হইলেন আমার অভিভাবক। সংসারে এক কাকীমা ভিন্ন আর স্ত্রীলোক ছিল না। তাঁহার দুইটি ছোট ছেলে ছিল। আমার একটি সহোদর ভাই ছিল, সে আমার ৩।৪ বৎসরের বড়। সে গ্রামের স্কুলে লেখাপড়া করিত। আমার কাকার সব গুণ ছিল,—আমাকে আপন সন্তানের মতন দেখিতেন; কিন্তু তাঁহার এক প্রধান দোষ ছিল, তিনি বড় মদ খাইতেন।

"আমার বিবাহের বয়স হইয়াছে দেখিয়া কাকা পাত্র খুঁজিতে লাগিলেন। সনাতনপুরের অমুক ঘোষ (এখনও তাহার নাম মুখে আনিতে সঙ্কোচ বোধ হয়, সেজন্য নাম করিলাম না)—সে ছিল আমার কাকার মদের এয়ার। আমাদের বাড়ীর কাছে একটা থানা ছিল, সে সেই থানায় কাজ করিত এবং প্রায়ই সন্ধ্যার পরে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া কাকার সঙ্গে বৈঠকখানায় বসিয়া মদ খাইত। নিজের রূপ-গুণের কথা নিজের মুখে বলা মহাপাপ। এখন যেটুকু দেখিতেছেন, তাহা হইতে

অবশ্য বুঝিতে পারেন, সেই উঠন্ত বয়সে আমার রূপ ছিল,—তাহাই আমার কাল হইল। সেই ঘোষও দেখিতে বেশ সুপুরুষ ছিল; কিন্তু তাহার বয়স তখন ত্রিশের উপরে। আর তাহার প্রথম পক্ষের এক স্ত্রী ছিল; কিন্তু সে না কি দেখিতে কুৎসিত বলিয়া সে তাহাকে লইয়া ঘর করিত না। সে নিজের রূপের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া কেবল সুন্দরী স্ত্রীলোক খুঁজিয়া বেড়াইত। সে পুলিসের জমাদারী চাকরি করিত, সেই সুযোগে নিজের কুবাসনা চরিতার্থ করিবার সুযোগও পাইত।

"আমার কাকা যখন আমার বিবাহের পাত্র খুঁজিতে ছিলেন, তখন সে আমাকে বিবাহ করার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া কাকাকে ধরিয়া বসিল। কাকা তাহার অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না; বিশেষতঃ তিনি দেখিলেন, এ লোকটা একটা সরকারী চাকরি করিতেছে, বিষয়-সম্পত্তিও কিছু আছে; সুতরাং ভাত কাপড়ের কষ্ট হইবে না, আর টাকাও কিছু দিতে হইবে না। এইরূপে সেই ঘোষের সঙ্গে আমার বিবাহ হইয়া গেল।

"বিবাহের পরে সে আমাকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেল। তখন আমার বয়স ১৩।১৪ হইবে। সংসারে তাহার এক সৎমা ছিলেন। তাঁহাকে সে দেখিতে পারিত না। তিনি পৃথক হইয়া থাকিতেন। সেই অল্প বয়সেই আমার উপর সংসারের ভার পড়িল। আমি অনেক সময়ে তাহার মনের মত কাজ করিতে পারিতাম না, সে জন্য সে আমাকে মারধর করিত। ক্রমে আমার বয়স বাড়িল, কিন্তু তবুও তাহার মনজোগান আমার পক্ষে কঠিন হইত। সে মদ খাইয়া নানাপ্রকার অত্যাচার করিত। এই ভাবে দুই বৎসর কাটিল। তখন ঘুস লওয়া অপরাধে তাহার পুলিশের চাকুরি গেল। তখন দেশে থাকিলে আর চলে না,—সে চাকরির চেষ্টায় কলিকাতায় গেল। আমাকে আমার কাকার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল।

"ইহার ছয় মাস পূর্ব্বে কাকার মৃত্যু হইয়াছিল। সেখানে সংসারের অভিভাবক একমাত্র কাকীমা। আমার দাদা তখন গ্রামের স্কুলের পড়া শেষ করিয়া মহকুমার স্কুলে পড়িতে গিয়াছিল। কিন্তু সেখানে কুসঙ্গে পড়িয়া তাহার স্বভাব খারাপ হয়। আমি তাহার নিকট কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছিলাম, অধিকাংশ ছাপার বই পড়িতে পারিতাম। দাদা যখন বাড়ী আসিত, তখন সে কত বাঙ্গলা বই সঙ্গে আনিত। আমি সেগুলি মনোযোগ দিয়া পড়িতাম। কিন্তু তাহার মধ্যে ভাল বই প্রায়ই থাকিত না। আমার বোধ হয় সেই সকল বই পড়িয়াই দাদা বেশী গোল্লায় গিয়াছিল। তবে, এ কথা পরে শুনিয়াছি, আমার স্বামীই না কি তাহাকে মদ খাওয়াতে হাতে-খড়ি দিয়াছিল।

"একটা কথা আছে, সৎসঙ্গে কাশীবাস—অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ। আমার কোন সৎলোকের সঙ্গ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু ঐ সকল খারাপ বই আমার অসৎসঙ্গের কাজ করিয়াছিল। ঐ সকল বই পড়িতে পড়িতে সময় সময় আমার রক্তে যেন আগুন ধরিয়া যাইত। কিছু দিন পরে আমার ফিট্ হওয়া আরম্ভ হইল। আজকাল প্রায় ঘরে ঘরে নানা কারণে হিষ্টিরিয়া দেখা দিয়াছে, কিন্তু সে সময়ে পাড়াগাঁয়ের লোকে এই রোগের প্রকৃত কারণ বুঝিতে না পারিয়া নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল। কেহ বলিল আমার উপর ভূতের দৃষ্টি হইয়াছে, কেহ বলিল কালীর ভর—ইত্যাদি। কাকীমা সেই সকল লোকের পরামর্শে নানা প্রকার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। কেহ জলপড়া খাওয়াইল, কেহ মন্ত্র পড়িয়া হাতে লাল সূতা বাঁধিয়া দিল। আবার একজনের ব্যবস্থা অনুসারে আমাকে এক শনিবার সন্ধ্যাকালে বাগান হইতে একটা গাছের শিকড় আনিয়া গলায় ঝুলাইতে হইল। কিন্তু এত করিয়াও কোন ফল হইল না।

"আমার যখন এই প্রকার অবস্থা, তখন এই বাড়ীর তোরাপ ফকির আমাদের গ্রামে উপস্থিত হইল। এ ব্যক্তি চাষবাস করিত, আবার ফকিরামি করিয়াও বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিত। ইহার নানা স্থানে অনেক শিষ্য ছিল। আমার কাকার বাড়ীর নিকটে ইহার এক শিষ্যবাড়ী ছিল,—সেখানে সে চিকিৎসা করিতে গিয়াছিল। সে অনেক মন্ত্রতন্ত্র জানিত,—অনেক লোক তাহার নিকট মাদুলী, কবচ, তেলপড়া, জলপড়া, সূতাপড়া লইতে আসিত। সে ভূর্জ্জপত্রে লাল কালী দিয়া কি সব মন্ত্র লিখিয়া দিত, লোকে তাহাই তামার মাদুলীতে পূরিয়া গলায় বা কোমরে ধারণ করিত। আপনি এখন যে ঘরে বসিয়া আছেন, এখানে বসিয়া এই সব কাজ হইত। কোন গ্রামে কলেরা হইলে, গ্রামী লোকেরা চাঁদা করিয়া তাহাকে লইয়া যাইত। সে যাইয়া বাড়ীর চারি কোণে মন্ত্র পড়িয়া শিকড় পুতিয়া দিয়া আসিত, আর রোগীকে জলপড়া খাওয়াইত। এক গ্রাম হইতে কলেরা বা গরুর মড়ক অন্য গ্রামে তাড়াইয়া দেওয়ারও না কি তার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু আমি এ সকল বিশ্বাস করি না।

"তাহার গুণ-জ্ঞানের কথা শুনিয়া আমার কাকীমা এক দিন তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া আমাকে দেখাইলেন। সে আমার চোখের দিকে তাকাইয়া বলিল,—ইহার উপর কালীর "দেষ্টে" হইয়াছে,—আমি আস্‌ছে অমাবস্যা রাত্রে একটা ঘরে বসিয়া কালীর পূজা করিব, ইহাকে সেখানে আসিতে হইবে, ঘরে আর কেহ আসিতে পারিবে না, পূজাতে জবা ফুল, ধূপ ধুনা লাগিবে। কাকীমা সম্মত হইলেন, কিন্তু আমি তাহার সঙ্গে একলা এক ঘরে বসিয়া থাকিতে প্রথমে স্বীকার করি নাই। কাকীমা নিতান্ত জেদ করিতে লাগিলেন—"তোর ভয় কি? আমি ত পাশের ঘরেই থাকিব, ও ফকিরের নাম ডাক আছে ভাল,—

দেখি, তোর যদি ব্যারামটা সারাইতে পারে।" আমি অগত্যা সম্মত হইলাম।

সেই অমাবস্যা রাত্রে ফকির আমাদের বাড়ীতে আসিল। তাহার বয়স তখন প্রায় ৩০ বৎসর, চেহারা কালো কোলো, গড়ন খুব বলিষ্ঠ। আমাদের পশ্চিমদ্বারী খড়ো ঘরের মধ্যে তাহার আসন হইল। সে ঘরটা আগে পরিষ্কার করিয়া লেপান হইয়াছিল। ঘরে ধূপ ধুনা জ্বালা হইল ও আমাকে তাহার সম্মুখে একখানা আসনে বসাইয়া সে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তখন আমার ভয় করিতে লাগিল, কিন্তু কাকীমা তাহার পাশে দক্ষিণদ্বারী ঘরে বসিয়াছিলেন, সেজন্য কিছু বলিলাম না। সে প্রথমে একটা ঘটিতে জল পড়িয়া সেই জল আমাকে খাইতে বলিল, আমি এক চুমুক খাইলাম। পরে আমার মাথায় একটা জবা ফুল বাঁধিয়া দিয়া আমাকে চক্ষু মেলিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিতে বলিল। সে বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিল, এবং সময় সময় "আয় কালী আয়—কার আজ্ঞা? শিবঠাকুরের আজ্ঞা" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিতে লাগিল। সে আমার চোখের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। এই রকম প্রায় এক ঘণ্টা থাকার পর আমার চোখ বুজিয়া আসিতে লাগিল। তখন গভীর রাত্রি, জনমানবের সাড়া শব্দ নাই। আমাদের বাড়ীর চারিদিকে বাগান ও জঙ্গল,—কাছে আর কোন বাড়ী ছিল না। কাকীমা বোধ হয় তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। ফকির আমাকে তখন বলিল—"দেখ, তোমাকে এক কাজ করিতে হইবে, তুমি লজ্জা করিও না, কালী যেমন এক পা সামনের দিকে আর এক পা পিছনের দিকে দিয়া বিবস্ত্র হইয়া দাঁড়ান, তোমাকেও সেই ভাবে দাঁড়াইতে হইবে। তোমার মধ্যে কালী আসিবেন, আমি তাঁহার পূজা করিব।" আমি তাহার এই লজ্জাজনক কথা শুনিয়া কিছুতেই উঠিয়া

দাঁড়াইলাম না। তখন সে আবার মন্ত্র পড়িয়া আমাকে জল খাইতে দিল ও আমার গায়ে জবা ফুল ফেলিয়া দিতে লাগিল। তিনবার ফুল দেওয়ার পর, আমি স্থির থাকিতে না পারিয়া মাটীতে শুইয়া পড়িলাম। তার পরে কি হইল আমার মনে পড়ে না, আমার চৈতন্য লোপ হইল।

আমার যখন আবার চেতনার সঞ্চার হইল, তখন আমি একখানা নৌকার মধ্যে। আমার পাশে সেই ফকির বসিয়া আছে, আর দুইজন লোক খুব জোরে নৌকা বাহিতেছে। আমি তখন কাঁদিয়া উঠিলাম। ফকির একখানা গামছা দিয়া আমার মুখ চাপিয়া ধরিল। সে খুব বলবান,—আমি তাহার সঙ্গে জোরে পারিব কেন। আমি একবার নৌকা হইতে জলে লাফ দিয়া পড়িতে চেষ্টা করিলাম। তাহা দেখিয়া ফকির আমার হাত চাপিয়া ধরিল, এবং নৌকার গুণের দড়ি দিয়া আমায় বাঁধিয়া রাখিল। এই অবস্থায় আমার বারবার ফিট্ হইতে লাগিল। ফকির তখন আমার চোখে-মুখে জল ছিটাইয়া দিল। রাত্রি যখন ভোর হয় তখন নৌকা একটা গ্রামে পৌঁছিল; এবং অন্ধকার থাকিতে থাকিতে ফকির আমাকে কাঁধে করিয়া তুলিয়া এক মুসলমানের বাড়ীতে লইয়া গেল। সেখানে একটা ঘরে আমাকে পূরিয়া, তাহার দরজা বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দিল। আমি সাত দিন পর্য্যন্ত সেখানে আটক ছিলাম।

পরে শুনিয়াছি, পরদিন সকালে আমাদের গ্রামে মস্ত একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। কাকীমা কাঁদিয়া অস্থির হইলেন,—আমাকে খুঁজিবার জন্য চারিদিকে লোক ছুটিল। সকলে গুজব রটাইয়া দিল,—আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ফকিরের সহিত গৃহত্যাগ করিয়াছি। আমার দাদা চিঠি পাইয়া বাড়ী আসিয়া এজাহার দিতে গেল। থানার দারোগা আগেই সে গুজব শুনিয়াছিল। সে কোন এজাহার না লইয়া, আমার স্বামীকে

আনাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে দরখাস্ত দিতে পরামর্শ দিল। আমার স্বামী তখন কোথায়? তাহার নিকট কলিকাতায় চিঠি লেখা হইয়াছিল। বোধ হয় সে ঐ চিঠি পায় নাই,—পাইলেও আসিত কি না সন্দেহ। পরে ফকিরের নিকট শুনিয়াছি, আমার স্বামীকে চেহারা দেখিয়া ভদ্রলোক বিবেচনা করিয়া এক বুড়ো দোকানদার তাঁহার বাড়ীতে আশ্রয় দিয়াছিলেন। সে সেই বৃদ্ধের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে কতকগুলি টাকা ও গহনাপত্রসহ বাহির করিয়া লইয়া গিয়া, কোথায় এক দোকান দিয়া স্বামী-স্ত্রী ভাবে বাস করিতেছিল।

যাহা হউক, আমার আর খোঁজ হইল না। ফকির আমাকে সাত দিন পরে আর এক গ্রামে লইয়া গেল; এবং এই রূপ নানাস্থানে ঘুরাইয়া অবশেষে তাহার এই বাড়ীতে লইয়া আসিল। এখানে আনিয়া মোল্লা ডাকাইয়া কলমা পড়াইয়া সে আমাকে নিকা করিল। তাহার দস্যুতার ভয়ে আমি তাহার মত অনুসারে চলিতে বাধ্য হইলাম। তাহার আর এক বৌ ছিল, তাহার কোন ছেলেপুলে হয় নাই। সে এখন ঐ ঘরে ব্যারাম অবস্থায় শুইয়া আছে। আমি থাকিবার জন্য একটা পৃথক ঘর চাহিলাম, এবং পৃথক রান্নাঘরে নিজ হাতে রাঁধিয়া খাইতে লাগিলাম। সে আমার হিঁদুয়ানী বজায় রাখিবার জন্য নহে—তখন আবার আমার হিঁদুয়ানী কোথায়?—ওদের হাতে খাইতে আমার প্রবৃত্তি হইত না। ক্রমে আমার গর্ভে চারিটি সন্তান হইল। তাহার প্রথম দুইটি মারা গিয়াছে; এখন দুইটি ছেলে বাঁচিয়া আছে। আমার সেই ফিটের ব্যারাম প্রথম সন্তান হওয়ার পরে আপনিই সারিয়া গেল। আজ ৩ বৎসর হইল সেই ফকির মারা গিয়াছে। সে যে জমি, বাড়ী, নগদ টাকা কড়ি রাখিয়া গিয়াছে, তাহাতে আমাদের খাওয়া পরার কষ্ট নাই।

"আমাকে বাড়ী আনার পরে ফকির সর্ব্বদা আমাকে খুসী করার চেষ্টা করিত। আমার থাকার জন্য পৃথক ঘর করিয়া দিয়াছিল এবং যাহাতে আমার সুখ-স্বচ্ছন্দতা বাড়ে সেই চেষ্টা করিত। আমি পেঁয়াজ—মুরগী খাই না বলিয়া সে নিজেও এ সকল খাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু হইলে কি হয়? আমি তাহাকে এক দিনের তরেও ভালবাসিতে পারি নাই। প্রথমে সে আমার উপর দস্যুবৃত্তি করাতে, তাহার প্রতি আমার যে বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিয়া ছিল, আমি কিছুতেই তাহা কাটাইতে পারি নাই। আমার স্বামীর প্রতিও আমার যে যথার্থ ভালবাসা জন্মিয়াছিল, এ কথা বলিতে পারি না। সে ছিল গ্রাম্য হিংস্র জন্তু, আর এই ফকির ছিল বন্য হিংস্র জন্তু।

"এখন মানুষ ত একটা অবলম্বন লইয়া থাকিতে চায়, নচেৎ সে কিরূপে বাঁচিবে? আমি এতকাল মুসলমানের সংসর্গে বাস করিলেও আমার শরীরে হিন্দুর রক্ত প্রবাহিত আছে। হিন্দুর সংস্কার এখনও আমার মনে ষোলআনা বর্ত্তমান। এখনও হিন্দুর বাড়ীতে পূজায় ঢাকঢোল বাজিতে শুনিলে আমার চোখে জল আসে। আমার এই জন্মগত সংস্কারই আমাকে আমার প্রকৃত পথ চিনাইয়া দিয়াছে। আমি ঘোর পাপী সন্দেহ নাই, নচেৎ আমার ভাগ্যে এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিবে কেন? কিন্তু এরূপ একজন ত আছেন, যাঁহার নিকট কাঁদিলে তিনি পাপীর দুঃখও শোনেন। আমি সেই হরির চরণে জীবন সমর্পণ করিয়াছি। ঐ দেখুন—উঠানের কোণে একটা তুলসী গাছ আছে; তাহার চারি পাশে আমি নিজের হাতে কত ফুলগাছ লাগাইয়াছি। ঐ তুলসীতলায় প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে প্রদীপ জ্বালিয়া বসি ও হরিঠাকুরকে কত ডাকি। ঐ সব ফুলগাছে যখন ফুল ফোটে, তখন মনে মনে সেই ফুল ঠাকুরের চরণে নিবেদন করি। ঐ শিউলি গাছের ফুল যখন শিশিরে ভিজিয়া

টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া তুলসীগাছের মাথায় পড়ে, তখন হাতযোড় করিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বলি, 'ঠাকুর, আমার পূজা গ্রহণ কর। আমি যবন হইয়াছি, আমার হতের ফুল ত তুমি লইবে না!' পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি কিছু লেখাপড়া জানিতাম,—এখন ছেলেদের পডাইতে পড়াইতে আরও কিছু শিখিয়াছি। শুনিয়াছি, নদীয়ার গৌরাঙ্গ যবন হরিদাসকে কোল দিয়াছিলেন,—হরিনামের এতই মাহাত্ম্য। দয়াল হরি কি এই পাপিষ্ঠাকে চরণে স্থান দিবেন না?"

এই বলিতে বলিতে তাহার চোখে জল আসিল। চক্ষু মুছিয়া আবার বলিল—"ছেলেদের ইতিহাসে লেখা আছে, দিল্লীর এক বাদশার এক হিন্দু বেগম ছিলেন; তিনি হিন্দুযানী বজায় রাখিয়া বাদশার সঙ্গে থাকিতেন ও প্রত্যহ যমুনায় স্নান করিতে যাইতেন। তাঁহার সঙ্গে আমার তুলনা হয় না, তবে এ কথা বলিতে পারি,—আমি ইচ্ছা করিয়া কোন অহিন্দুর আচরণ করি না।

"এই ত আমার জীবনের কেচ্ছা আপনাকে সব খুলিয়া বলিলাম! শুনিয়াছি, নিজের পাপের কাহিনী অন্যের কাছে নিজের মুখে ব্যক্ত করিলে পাপের লাঘব হয়। আমি কত দিন মনে করিয়াছি—আমার দাদা কি আর কোন আত্মীয় আমাকে খুঁজিতে খুঁজিতে এখানে আসিবে, আমি তাহাদিগকে দেখিয়া চক্ষু জুড়াইব ও আমার এই দুঃখের কাহিনী শুনাইব। ঐ নদী দিয়া কত নৌকা যায়, আমি ঘাটের পাড়ে বসিয়া থাকি। কিন্তু আমার এমনই পোড়াকপাল, সে অঞ্চলের কাকটা পর্য্যন্ত এদিকে আসে না। কোন হিন্দু ভদ্রলোককে দেখিলে তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া মনের জ্বালা জুড়াইতে ইচ্ছা করে। তাই আজ যখন আপনাকে ওখানে বসিয়া থাকিতে দেখিলাম; তখন আপনার সঙ্গে কথা কহিলাম। আপনি হয়ত আমাকে

নিতান্ত নির্লজ্জা মনে করিয়াছেন। আপনার চেহারা কতকটা দাদার মত। পরে যখন আপনি আপনার নাম বলিলেন, তখন জানিলাম, আপনার যে নাম—আমার দাদারও সেই নাম। আপনি আমার ধর্ম্ম-ভাই। আর যদি কখনও এ পথে আসেন, তবে এই দুঃখিনীকে দেখিয়া যাইবেন। ভাল কথা---যে গরম পড়িয়াছে, আপনি একটু জল খান। আমার হাতের ছোঁয়া জল খাইতে বলি না, আমি একটা পিতলের ঘটী ও গেলাস মাজিয়া দিতেছি, ঐ নদী হইতে আপন হাতে জল তুলিয়া আনুন। আমার ঘরে হরির লুটের বাতাসা আছে, তাই দিয়া জল খান।"

আমি তার এই বিষাদপূর্ণ কাহিনী শুনিতে শুনিতে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিলাম। এবার উঠিয়া বলিলাম—

"দাও বোন, আমি জল আনিয়া খাইতেছি।"

সে অমনি একটা ঘটী ও গেলাস আনিয়া দিয়া বলিল "ঐ যে আমার ছেলেরা স্কুল থেকে আসিতেছে।"

আমি নদী হইতে জল আনিয়া দেখিলাম, দুইটি সুকুমার শিশু উঠানে দাঁড়াইয়া কলা খাইতেছে। তাহারা মায়ের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ পাইয়াছে। আমাকে আসিতে দেখিয়া আমিনা বলিল, "ঐ দেখ্ উনি তোদের মামু—ওঁকে সেলাম কর।"

শিশু দুটি আমার কাছে আসিয়া সেলাম করিল—আমি তাহাদের মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলাম। আমিনা আমার জলখাবার বাতাসা আনিয়া বলিল, "ঘরে ভাল পাকা কলা আছে, তাহার দুটা দিই?" আমি কলা আনিতে সম্মতি দিলাম।

আমি যখন উঠানে বসিয়া জলযোগ করিলাম, তখন সে কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে আমি যখন বিদায় হই, তখন সে তাড়াতাড়ি

আসিয়া আমার হাতে নেকড়ায় বাঁধা আর কতকগুলি কলা গুঁজিয়া দিয়া বলিল—

"দাদা, এগুলি বাড়ী গিয়া ছেলেদের দেবেন।"

তাহার স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে আমার চোখে জল আসিল। আমি তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিলাম।

গনির মা

এক

কুতুবপুরের রহম সেখ তাহার স্ত্রী ফুলজান বিবি ও একমাত্র শিশুপুত্র গনিকে রাখিয়া হঠাৎ মারা গেল। ফুলজানের বয়স তখন ২৫, দেখিতেও সে সুন্দরী। আবার রহম সেখ যে দশ বিঘা জমী রাখিয়া গিয়াছিল, তাহাতে খুব ধান ও পাট জন্মায়। অল্পদিনের মধ্যেই ফুলজানের চারি পাশে অনেক মধুকর গুণ্ গুণ্ করিতে লাগিল। কিন্তু ফুলজান বলিল—"আমি কোনো গোলামের ধার ধারি না, আল্লার দোয়ায় আমার গনি বাঁচিয়া থাকুক্।"

ফুলজানের পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে কেফাতুল্লা সেখ সেই গ্রামের একজন মাতব্বর। তাহার মত দাঙ্গাবাজ ও অত্যাচারী লোক আশেপাশে চারি পাঁচ গ্রামের মধ্যে ছিল না। তাহার বয়স প্রায় ৪৫, দেখিতে অত্যন্ত কদাকার; কিন্তু খুব বলবান্। তাহার লাঠীর জোরে কেহ তাহার সম্মুখীন হইতে সাহস করিত না। এই মুসলমানপ্রধান গ্রামে তাহার একটা প্রবল দল ছিল। আবশ্যক হইলে এই দলের লোক অন্ত লোকের বাড়ী লুঠ করিত, কেফাতুল্লার ভয়ে কেহ থানায় এজাহার দিতে যাইত না, কারণ, পুলিস কি প্রকারে বাধ্য রাখিতে হয়, কেফাতুল্লা সে বিষয়ে এক জন ওস্তাদ ছিল।

এ হেন কেফাতুল্লা যখন ফুলজানের প্রেমপ্রার্থী হইয়া তাহার নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিল, তখন সে বেচারী প্রমাদ গণিল। সে জানিত,

কেফাতুল্লার আর দুইটি কবিলা ছিল, তাহারা তাহার প্রহারের চোটে সর্ব্বদা চোখের জলে ভাসিত।

একদিন বৈকালে ফুলজান তাহার উঠানে বসিয়া ধান ঝাড়িতে ছিল, তখন সে কেফাতুল্লার চীৎকার শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে দেখিল, তাহার আট বৎসরবয়স্ক পুত্র গনি ভীত-চকিত হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে, আর কেফাতুল্লা লাঠি হাতে করিয়া তাহাকে তাড়া করিতেছে।

"শালার বেটা শালা! গরু ছাইড়িয়া দিয়া আমার পাট খাওয়াইস্! এই লাঠির বাড়িতে তোর পাট খাওয়ান বাইর কর্যা দেব! হারামজাদা!"

ইহা বলিতে বলিতে কেফাতুল্লা গনির অনুসরণ করিয়া ফুলজানের কাছে আসিল। গনি কাঁপিতে কাঁপিতে মাতার বস্ত্রাঞ্চলে আশ্রয় লইল। তখন কেফাতুল্লা রোষ-কষায়িত নয়নে ফুলজানের দিকে তাকাইয়া বলিল—"মাগী, তোর গরু বাঁধতি পারিস্‌না! হারামজাদী—শালী!"

ফুলজান মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া ভীত কণ্ঠে বলিল—"মাতুব্বরের বেটা, আমার গরু ত বাঁধাই থাকে, আজ কেমনে ছুটে গেছিল। আমি জান্‌তি পার্যা গরু ধরতি গনিরে পাঠায়াছিলাম। আমার ছাওয়াল নিতান্ত নাবাল্লক। আজকের কসুর মাপ কর।"

ফুলজানের এই কাতরোক্তিতে কেফাতুল্লা একটু নরম হইয়া বলিল—"আচ্ছা, আজকের কসুর যেন মাপ করলাম্। কিন্তু কুটি বচ্ছু, আমার সাথে আড়ি কর্যা কয়দিন তুই এখানে থাক্‌বি?"

ফুলজান কেফাতুল্লাকে বসিবার জন্য পিঁড়ি আগাইয়া দিয়া বলিল—"তুমি আমার উপর অনুরাগ করলি এক দিনও আমি এ গেরামে টিক্‌তি পারব না, তা ত আমি খুব জানি।" কেফাতুল্লা সেই পিঁড়িতে বসিয়া বলিল,—"তবে আমার কথা শুনিস্ না ক্যান্? আমি ত তোর ভালোর

জন্যিই কই, আমার সাথে নিকা বস্যা আমার বাড়ীতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌বি—আমার আর যে দুই কবিলা আছে, তারা তোর বাঁদী হয়্যা থাক্‌বে। ঐ যে রাণী রাসমণি যেমন খাটের উপর পা ছড়াইয়া বস্যা থাকে, তেনার দুই পাশে দুইটা চিনির বস্তা থাকে—একবার ডান হাত দিয়া এক মুঠো চিনি মুখে ছ্যায়, আবার বাও হাত দিয়া আর এক মুঠো চিনি মুখে ছ্যায় · তোরও সেই রকম সুখ হবে।”

ফুলজান তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল—“মাতুব্বরের বেটা, আমার কথা ত তোমারে আগেই বল্‌ছি। আমি রাসমণির সুখ চাই না। আমার জীবনের সুখ সেই এক জনের সাথেই গেছে। এখন খোদাতাল্লার মরজীতে নাবাল্লক বাঁচ্যা থাক্।”

কেফাতুল্লা উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্রোধভরে বলিল—“তবে তুই তোর ছাওয়াল নিয়ে থাক। আবার যদি আমার ক্ষ্যাতে তোর গরু যায়, তবে তার মাথা ফাঠাব, এ কথা আমি আগেই কয়্যা গেলাম।”

এই বলিয়া ক্রোধভরে কেফাতুল্লা চলিয়া গেল।

দুই

ইহার তিন দিন পরে ফুলজানের গরু আবার ছুটিয়া গেল। গনি সারাদিন গরু খুঁজিয়া পাইল না। তাহাদের প্রতিবেশী তমিজদ্দী আসিয়া সংবাদ দিল, সেই গরু দুই মাইল দূরে রসুলপুর খোঁয়াড়ে আটক রহিয়াছে। ফুলজানের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, ইহা কেফাতুল্লার কারসাজি। সে তমিজদ্দীকে ধরিল—“চাচা, তুমি গনির সাথে যাইয়া আমার গরুডা খালাস কর‍্যা আন, যে পয়সা লাগে, তা আমি দিতেছি।”

তাহার অনুনয়ে বাধ্য হইয়া তমিজদ্দী গরু খালাস করিতে গেল।

খোঁয়াড়ের মাসুল আইনানুসারে ।/০ আনা, গনি ॥০ আনা লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেই খোঁয়াড়ের মুন্সী বলিল, ৩৲ টাকা না পাইলে সে কিছুতেই গরু ছাড়িবে না। তমিজদ্দীও অগত্যা ফিরিয়া আসিল। ফুলজানের হাতে তখন টাকা ছিল না, সে তমিজদ্দীর নিকট একখানা "জেওর" অর্থাৎ রূপার মল বন্ধক রাখিয়া ৩৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা গরু খালাস করিয়া আনিল।

আর এক দিন ফুলজানের বর্গাদার আরজান আসিয়া তাহাকে জানাইল সে ফুলজানের বর্গা জমীতে যে আউস ধান বুনিয়াছিল, কেফাতুল্লা লোকজন জুটাইয়া আনিয়া তাহা কাটিতেছে। সে জমীটা ফুলজানের বাড়ীর খুব নিকটে। ফুলজান আরজানকে সঙ্গে লইয়া সেখানে গিয়া দেখিল, তিন জন লোক সেই জমীর ধান কাটিতেছে, কেফাতুল্লা সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। ফুলজান কাঁদিতে কাঁদিতে সরকার বাহাদুরের দোহাই দিল। কেফাতুল্লা তাহার কাছে আসিয়া বলিল—"কুটি বজু, এখন কাঁদলি কি হবে? আমি তোর দোহাই মানি না। তোর খসম আমার কাছে এই জমী বন্ধক রাখ্যা ৫০৲ টাকা কর্জ্জ নিছিল। এর অর্দ্ধেক ফসল আমি পাব, বাকী অর্দ্ধেক বর্গাদার নেবে। এই খ্যাখ সেই দলিল।" এই বলিয়া কেফাতুল্লা একখানা ষ্ট্যাম্পে লেখা খত ফুলজানকে দেখাইল।

ফুলজান চক্ষু মুছিয়া বলিল—"মাতুব্বরের ব্যাটা, আমার খসম ত কোন দিন ও টাকা কর্জ্জ করার কথা কয় নাই, সে বরাবর এই জমী নিজ হাতে চষিত, আমি এবার আরজানরে বর্গা দিছি। দোহাই তোমার খোদাতালার! আমি নিতান্ত কাঙ্গাল, কোন রকমে নাবাল্লক ছাল্যাডা নিয়ে ভিটাডার উপরে আছি। তারে ফাঁকি দিয়া বঞ্চিত কইরো না।"

কেফাতুল্লা বলিল—"আমার এ দলিল বুঝি মিথ্যা? গ্রামের তিন চার জন সাক্ষী আছে। হারামজাদী! মুখ সামলাইয়া কথা কহিস্।"

এই বলিয়া কেফাতুল্লা সেই জমীতে ফিরিয়া গেল। ফুলজান দুঃখিত অন্তঃকরণে বাড়ী আসিয়া মুখে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। ধান কাটা শেষ হইলে, কেফাতুল্লা তাহার বাড়ীর নিকট দিয়া যাইবার সময় তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া তাহার কাছে আসিল এবং মৃদু হাস্য করিয়া বলিল,—"কি বিবিজান! আমার আরজডা শুন্‌লে না, তোমার সেই ছিল ভাল, না এই ভাল?"

ফুলজান তাহার প্রতি রোষপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। সে শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল, কি প্রকারে সে এই দুর্দ্দান্ত লোকের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবে? তাহার অত্যাচারের মাত্রা যে ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। সে কি প্রকারে তাহার নাবালক পুত্রকে বাঁচাইবে? তবে কি সে পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এই অত্যাচারীর নিকট আত্মসমর্পণ করিবে? কিন্তু তাহার মৃত স্বামীকে সে কিরূপে ভুলিবে? ফুলজান যে এখনও তাহাকে কত ভালবাসে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে চোখের জলে মাটী ভিজাইল। অবশেষে সে সঙ্কল্প করিল, যদি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়, তাহাও স্বীকার, তবু সে তাহার স্বামীকে ভুলিয়া আর কাহারও সঙ্গে নিকা বসিবে না। খোদা কি তাহার শিশুসন্তানকে রক্ষা করিবেন না?

তিন

ইহার কিছুদিন পরে সেই গ্রামে কলেরা দেখা দিল। গ্রামের মেনাজদ্দী সেখের প্রথমে ভেদবমি হয়; তাহাতেই সে দুই দিনের দিন

মারা গেল। পরে তাহার কবিলার ও দুইটি ছেলের এই ব্যারাম হইল। কেফাতুল্লা গ্রামের অন্যান্য মাতব্বরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ১০৲ টাকা চাঁদা তুলিয়া হেমাইতপুরের কেরামতালী ফকিরকে লইয়া আসিল। ফকির আসিয়া গ্রামের চারি কোণে চারিটা গাছের শিকড় মন্ত্র পড়িয়া পুতিয়া দিল, ইহাতে না কি এই গ্রামের কলেরা অন্য গ্রামে তাড়িত হইবে। আর মেনাজদ্দীর কবিলা ও ছেলেদিগকে জল পড়িয়া খাওয়াইল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। এই তিনটি রোগীই মারা গেল এবং মেনাজদ্দীর বাড়ীতে আর দুইটির ব্যারাম হইল। ইহার পরে সেই কেরামতালী ফকিরের যখন এক দিন ভেদবমি আরম্ভ হইল, তখন সে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। মেনাজদ্দী কতকটা অবস্থাপন্ন লোক, সে কেফাতুল্লার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া রহমতপুর হইতে আবদুল করিম ডাক্তারকে আনিল। আবদুল করিম একজন হাতুড়ে, সে সামান্য বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখিয়া একটা ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে দুই বৎসর কাজ করিয়াছিল। এখন সে নিজ গ্রামে বসিয়া চিকিৎসা করিতেছিল। ডাক্তার আসিয়া কেফাতুল্লার বাড়ীতে বাসা করিয়া রোগীদিগের চিকিৎসা আরম্ভ করিল এবং সৌভাগ্যক্রমে মেনাজদ্দীর বাড়ীর একটি লোক আরাম হইল, অন্যটি মারা গেল। কিন্তু সেই দিনই আবার ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে আর চারি জনের কলেরা হইল। কাজেই গ্রামের লোকরা চাঁদা করিয়া ডাক্তারকে গ্রামে রাখিতে বাধ্য হইল। ডাক্তার দেখিলেন, গ্রামের লোক যে পুষ্করণীর জল পান করে, তাহার মধ্যে রোগীর কাঁথা কাপড় কাচাতে উহার জল দূষিত হইয়াছে। তিনি সকলকে বলিলেন,—"তোমাদের ফকির আসিয়া গ্রামের চারিদিকে শিকড় পুতিয়া গ্রামবন্ধন করিয়াছিল, তাহাতে কলেরা থামে নাই। আমি বলি, তোমরা এই পুকুরের জল কেহ খাইও না। কলেরার

বিষে ইহার জল দূষিত হইয়াছে। এই জল না খাইলেই কলেরা থামিবে।”

ডাক্তারের কথা শুনিয়া সকলে হাসিল, কেহ তাঁহার কথা বিশ্বাস করিল না, কারণ, তিনি ফকির নহেন, একজন ডাক্তার।

এক দিন রাত্রি ৮টার সময় আবদুল করিম ডাক্তার কেফাতুল্লার “কাছারী-ঘরে” বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, কেফাতুল্লা তাঁহার নিকট বসিয়া ছিল। এই সময়ে তমিজদ্দী আসিয়া বলিল,—“ডাক্তার ছাহেব, আপনার একবার আসতি হবে।”

ডাক্তার বলিলেন,—“কোথায় ?”

“ঐ রহম সেখের বাড়ী। তার ছাওয়াল গনির ভেদবমি হইছে।”

এই কথা শুনিয়া কেফাতুল্লা কাণ খাড়া করিয়া বলিল,—“গনির মা তোমারে প্যাঠাইছে ? ডাক্তারের টাকা দিতি পারবে ?”

“কিসের টাকা ? শোনলাম, ডাক্তার টাকা স্যান না, গ্রামের লোকরা চাঁদা কর্য্যা তেনারে আন্‌ছে।”

কেফাতুল্লা একটু উষ্ণভাবে বলিল,—“সে মাগী এক পয়সাও চাঁদা দেয় নাই। ডাক্তার তার বাড়ী যাবেন ক্যান্ ? যাবেন না। সে যদি দুই টাকা দেয়, তবে ডাক্তার যাবেন।”

এই কথা শুনিয়া তমিজদ্দী চলিয়া গেল। ফুলজান তাহার ঘরে গনির পাশে বসিয়া বাতাস করিতেছিল। গনি কেবল জল জল করিয়া প্রবল তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল। তমিজদ্দী যাইয়া কেফাতুল্লার কথাগুলি ফুলজানকে বলিল। ফুলজানের মুখ ঘৃণায় বিবর্ণ হইয়া গেল। কেফাতুল্লা এত দূর পাষণ্ড যে, এই ঘোর বিপদের সময় তাহার উপর নির্য্যাতন করিতে একটুও কুণ্ঠিত হইল না। কিন্তু উপায় ? তাহার হাতে একটি টাকাও নাই। সে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া তমিজদ্দীকে বলিল—“চাচা,

আমার আর একখান জেওর আছে, তা' রাখ্যা আমারে পাঁচটা টাকা দিতি পার ?”

তমিজদ্দী কহিল, “আমার ঘরে আর টাকা নাই।”

ফুলজান কহিল,--“আর কারও কাছে পাওয়া যায় কি না দেখ।”

তমিজদ্দী কহিল,—“আর কোথায় টাকা পাব ? গ্রামে ত আর কোন মহাজন নাই, কেবল কেফাতুল্লাই সময় সময় টাকা ধার দেয়। সে ত তোমারে দেবে না; আচ্ছা, আমি নস্কার মামুদের কাছে একবার যাই, যদি সে টাকা দেয়।”

এই বলিয়া তমিজদ্দী প্রস্থান করিল। এই সময় গনি আর একবার বাহিরে গেল, এবং ফুলজান তাহাকে ধরিয়া আনিবার সময় সে দুর্ব্বলতার জন্য পিঁড়ার উপর শুইয়া পড়িল। তাহার অবস্থা দেখিয়া ফুলজান কাঁদিয়া উঠিল।

কেফাতুল্লা জানিত, গনির মা ডাক্তারের জন্য অবশেষে তাহারই শরণাপন্ন হইবে। তমিজদ্দী চলিয়া আসিলে, সে গরু খুঁজিবার ছলে বাহির হইয়া ফুলজানের কান্না শুনিয়া “কুটি বড়ু, গনি কেমন আছে ?” বলিয়া আসিয়া সে উঠানে দাঁড়াইল।

ফুলজান ক্রোধে ও ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইল। একবার মনে করিল, ঐ পাষণ্ডের সঙ্গে কথাই কহিবে না। পরে ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া নিতান্ত কাতর স্বরে বলিল—“মাতুব্বরের বেটা, তুমি আমার উপর বাদ সাধবার আর বুঝি সময় পাইলা না ?”

কেফাতুল্লা কহিল,—“তোমারে সুখে থাক্‌তি ভূতি কিলাবে, আমি তার কি করবো ? আমার বাড়ীতে থাকলি তোমার এত দুস্কু-কষ্ট হবে ক্যান্ ?”

ফুলজান ক্রুদ্ধা হইয়া বলিল,—"ছিঃ !—আবার সেই কথা ! আমার জান্ গেলেও তোমার মত লোকের সাথে নিকা বসবো না। আমার জমীর উপর তোমার লোভ হইছে, তুমি সেই জমী ন্যাও, আর ডাক্তার আন্যা আমার গনিরে বাঁচাও। দোহাই তোমার আল্লার !"

কেফাতুল্লা ব্যঙ্গ করিয়া বলিল,—"বিবিজান্, এত গরম হও ক্যান্ ? তোমার এত 'ত্যাজ' ক্যান্ ? আমি তোমার জমীর কাঙ্গাল না। আমি চল্লাম।"

এই বলিয়া কেফাতুল্লা বাড়ীর বাহির হইল। ফুলজান নিতান্ত নিরুপায় হইয়া উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া মনে মনে বলিল,—"আল্লা! তোমার মনে এই ছিল !" এই বলিয়া এক মিনিটকাল নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া কি ভাবিল। পরক্ষণেই মন স্থির করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বাহিরে আসিয়া কেফাতুল্লাকে ডাকিল,—"মাতুব্বরের বেটা !"

কেফাতুল্লা বেশী দূর যায় নাই, সে ডাক শুনিয়া ঘরের দুয়ারে আসিল। ফুলজান তাহাকে দেখিয়া বলিল,—"মাতুব্বরের বেটা ! আমার কপালে যা আছে তাই হবে। আমি রাজী ; তুমি ডাক্তাররে বোলাও।"

এইরূপে সেই চির-মহিমময় মাতৃহৃদয় সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিল !

কেফাতুল্লা অমনই দৌড়াইয়া গিয়া সেই ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার রোগীকে পরীক্ষা করিয়া ঔষধ দিলেন। গনির নিতান্ত পরমায়ুর জোর ছিল, তাই সেই হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসায়ও সে বাঁচিয়া উঠিল।

ইহার এক মাস পরে কেফাতুল্লার সহিত ফুলজানের নিকা হইল। কেফাতুল্লা আসিয়া তাহার জমী বাড়ী দখল করিয়া বসিল।

চার

ফুলজান কেফাতুল্লার সংসারে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সেখানে রাণী রাসমণির সুখ ত নাই-ই, সামান্য কৃষক-গৃহিণীর সুখও নাই। কেফাতুল্লার আর দুইটি স্ত্রীর যে দশা, তাহারও সেই দশা ঘটিল। নিজের গৃহে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল, এখানে সে সেই দুর্দ্দান্ত লোকের অধীন। কেফাতুল্লা তাহার অপর দুই স্ত্রীকে সামান্য ত্রুটির জন্য প্রহার করিত, ফুলজান তাহা দেখিয়া ভাবিত, কবে তাহার ভাগ্যেও সেই প্রকার আদর ঘটিবে। সে তাহার পূর্ব্ব স্বামীর ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকিত। সে তাহার জীবনের সম্বল শিশুটির প্রাণরক্ষার জন্য স্বেচ্ছায় এই দাসীত্ব স্বীকার করিয়াছিল, এখন কিসে সেই শিশুটি মানুষ হইবে, ইহাই সে সর্ব্বদা ভাবিত। সে গনিকে গ্রামের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়ার জন্য কেফাতুল্লাকে অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু কেফাতুল্লা বলিল—"চাষার ছাওয়াল ন্যাখাপড়া শিখ্যা বাবু হবে, সে আর ক্ষ্যাতখামারের কাম করবে না।" সুতরাং গনিকে স্কুলে দেওয়া হইল না। কেফাতুল্লা গনির ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার পথ ঠিক করিয়া তাহাকে নিজের গরুর রাখাল নিযুক্ত করিল।

এক দিন মনিরদ্দী আসিয়া কেফাতুল্লার কাছে নালিশ করিল, কেফাতুল্লার এক পাল গরু তাহার কলাইয়ের ক্ষেতে ঢুকিয়া সব ফসল নষ্ট করিয়াছে। ইহা শুনিয়া কেফাতুল্লা অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গনিকে মারিবার জন্য ধাবিত হইল। গনি ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার সেই একমাত্র আশ্রয়স্থান মাতৃ-অঞ্চলে লুকাইল। "শালার বেটা, আজ তোর এক দিন আর আমার এক দিন," ক্রোধভরে ইহা বলিতে বলিতে

কেফাতুল্লা গনিকে লক্ষ্য করিয়া লাঠীর বাড়ি মারিল। ফুলজান তাহা ঠেকাইতে গিয়া নিজে আহত হইল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"এই রকম একটা লাঠীর বাড়ি খালি ও ত এখনই মর‍্যা যাইত—ওর যে পুঁটীর প্রাণ। মারো—আজই ওরে মার‍্যা ফ্যালো - তোমার আপদবালাই দূর হউক!"

কেফাতুল্লা আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"উনি এক নবাবের বেটা নবাব। ওনারে কোনো কামে দিলি এই রকম গাফিলি করবেন আর বস্তা বস্তা চারবেলা খাবেন। এত খাওয়া আসে কোথার থেকে?"

ফুলজান চক্ষু মুছিয়া বলিল,—"ও তোমার ভাত খায় কি না? ওর যেন নিজির কিছুই নাই। ওরে মার‍্যা ফেলতি পারলিই তুমি বাঁচ!"

কেফাতুল্লা ভয়ানক চটিয়া উঠিয়া বলিল—"কি বল্লি, হারামজাদী! তোর ছোট মুখি বড় কথা? আমি ওনারে যতই খাতির কর‍্যা চলি, উনি ততই আসকার‍্যা পাইয়্যা গেছেন। লাথির ঢেঁকি মাথায় চড়লি এই দশাই হয়।"

এ দিনকার পালা এখানেই শেষ হইল।

পাঁচ

কুতুবপুর স্কুলে আজ বড় ধূম। আজ ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টার মৌলবী এমদাদ আলী স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। স্কুলঘর লতা-পাতা দিয়া সজ্জিত করা হইয়াছে, শিক্ষক ও ছাত্রগণ যথাসম্ভব পরিষ্কার কাপড় পরিয়া স্কুলে আসিয়াছে। এই মুসলমানপ্রধান স্থানে স্কুলের শিক্ষক তিনটিই মুসলমান, ছাত্রদের মধ্যেও অধিকাংশ মুসলমান।

মৌলবী সাহেব একটি ক্লাসে বসিয়া ছাত্রদের পরীক্ষা করিতেছেন। সে ক্লাসে দশটি ছাত্র। তিনি প্রশ্ন করিলেন,—

"বল ত তাজমহল কোথায় ?"

একটি ছাত্র বলিল—"আগ্রায়।"

"তাজমহল কে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ?"

একটি ছাত্র বলিল—"সম্রাট আকবর।"

"না, ভুল বলিযাছ।"

এই বলিয়া তিনি অন্যান্য ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহই সদুত্তর দিতে পারিল না। এই সময়ে স্কুল-ঘরের বারান্দা হইতে উত্তর আসিল—

"সম্রাট সাজাহান।"

মৌলবী সাহেব সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, একটি সৌম্য-দর্শন বালক সেখানে বসিয়া আছে, তাহার কিছু দূরে মাঠে কতকগুলি গরু চরিতেছে। তিনি সেই বালকটিকে কাছে ডাকিলেন এবং শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ ছেলেটি বাহিরে বসিয়া আছে কেন ? এ কোন্ ক্লাসে পড়ে ?"

শিক্ষক বলিলেন—"আজ্ঞে, ও স্কুলে পড়ে না—এই মাঠে গরু চরায়, আর প্রায়ই এই বারান্দায় আসিয়া বসিয়া থাকে ও পড়ানো শোনে।"

মৌলবী সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া সেই ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি বই পড়তে পার ?"

বালক বলিল—"না। আমি অক্ষর চিনি না।"

"আচ্ছা, সাজাহান কে, তুমি জান ?"

"জানি,—জাহাঙ্গীর বাদশার ছেলে সাজাহান।"

"জাহাঙ্গীরের বাপের নাম কি ?"

"আকবর।"

"সাজাহানের কয় ছেলে ছিল ?"

"দারা, মুরাদ, ঔরঙ্গজেব, সুজা।"

"ইহাঁদের মধ্যে কে বাদশা হয়েছিলেন ?"

"ঔরঙ্গজেব।"

"তুমি এ সব কোথায় শিখলে ?"

"এখানে বসিয়া। আমি যা' একবার শুনি, তা' কখনও ভুলি না। এই যে সব বই এখানে ছেলেরা পড়ে, আমি তা'ও কিছু কিছু শিখেছি।"

"আচ্ছা, কি শিখিয়াছ শুনি। একটা কবিতা মুখস্থ বল ত।"

অমনই সে মুখস্থ বলিল—

"ক্রোধের সমান পাপ না আছে সংসারে।
প্রত্যক্ষ শুনহ ক্রোধ যত পাপ ধরে॥
লঘু গুরু ভেদ নাহি থাকে ক্রোধকালে।
অসত্য বচন লোক ক্রোধকালে বলে॥
থাকুক অন্যের কায নিজে হয় অরি।
বিষ খায় ডুবে মরে, অস্ত্র অঙ্গে মারি॥
ক্রোধে পাপ ক্রোধে তাপ ক্রোধে কুলক্ষয়।
ক্রোধ হেতু মানুষের সর্ব্বনাশ হয়॥
হেন ক্রোধে যেই জন জিনিবারে পারে।
ধন্য তারে বলে সবে পৃথিবী-মাঝারে॥"

মৌলবী সাহেব এই রাখাল-বালকের অসাধারণ মেধা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাহার আবৃত্তিও খুব চমৎকার। তিনি তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল,—"আমার নাম গনি।"

মৌলবী সাহেব স্কুল পরিদর্শন শেষ করিয়া রসুলপুরের ডাকবাংলায় গিয়া অবস্থিতি করিলেন। যাইবার সময় এই রাখাল-বালকের

অভিভাবক কেন উহাকে স্কুলে পড়িতে দেয় না, ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করিলেন, এবং কেফাতুল্লাকে চৌকীদার দ্বারা ডাকিয়া পাঠাইলেন।

কেফাতুল্লা যখন শুনিল, এক ডেপুটী সাহেব তাহার তলব করিয়াছেন, তখন সে ভাল এক ছড়া পাকা কলা ভেট লইয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেল। মৌলবী সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গনি ছেলেটি তোমার কে?"

"আজ্ঞে, হুজুর, সে আমার শ্বাষপক্ষের নিকার কবিলার প্রথম পক্ষের ছওয়াল।"

"তুমি তাকে স্কুলে পড়তে দেও না কেন?"

"হুজুর! আমি নিতান্ত গরিব, পড়ার খরচ দিতি পারি না।"

"আচ্ছা, আমি যদি উহার পড়ানর ভার লই, তবে তোমার কোন আপত্তি আছে কি?"

কেফাতুল্লা তাঁহার কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তখন পার্শ্বে দণ্ডায়মান স্কুলের শিক্ষক মুন্সী আদিলদ্দীন তাহাকে সকল কথা বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন,—"মিঞা, তোমার এই হাতুয়া ছেলের অদৃষ্ট খুব ভাল। সে হুজুরের নেকনজরে পড়িয়াছে। তুমি উহাকে হুজুরের সঙ্গে যাইতে দেও। ও লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হবে।"

সেই "হাতুয়া" ছেলের উন্নতির চিন্তায় কেফাতুল্লার যেন রাত্রিতে ঘুম হইত না। সে মনে করিল, তাহার ঘাড় থেকে যদি একটা বোঝা নামিয়া যায়, তবে সে ত ভাল কথা। আর তার জমী বাড়ীরও সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মালিক হইবে। তবে তার মাতা ফুলজানকে রাজী করিতে পারিলে হয়। সে বলিল, "হুজুরের যে মর্জী। ওরে ছাড়িয়া দিতি আমার কোন আপত্তি নাই। তবে ওর মা রাজী হইলে হয়।"

মৌলবী সাহেব গনির মাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিবার জন্য আদিলদ্দীন মুন্সীকে কেফাতুল্লার সঙ্গে পাঠাইলেন।

ফুলজান যখন পুত্রের গুণগরিমার কথা শুনিল, তখন সে তাহাকে কোলে করিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিল। সে ভাবিয়া দেখিল, এখানে থাকিলে তাহার লেখাপড়া শেখার কোন আশা নাই, বরং কোন্ সময়ে কেফাতুল্লার লাঠির আঘাতে তাহার প্রাণ বাহির হইবে। মৌলবী সাহেব যদি দয়া করিয়া তাহাকে তাঁহার নিজের বাসায় রাখিয়া লেখাপড়া শেখান, তবে ত ফুলজান বাঁচিয়া যায়। তবে এক কষ্ট, সে তাহাকে দীর্ঘকাল না দেখিয়া কি প্রকারে থাকিবে? কিন্তু কাছে রাখিলেও ত তাহার সুখ নাই। যাহাতে ছেলের ভবিষ্যতে মঙ্গল হয়, তাহার তাহাই করা কর্ত্তব্য।

এই সকল বিবেচনা করিয়া সে গনিকে মৌলবী সাহেবের সঙ্গে যাইতে অনুমতি দিল। গনি মাতার নিকট হইতে যাইবার সময় অনেক কাঁদিল, ফুলজানেরও যেন তাহাকে দূরে পাঠাইতে কলিজা ছিঁড়িয়া গেল। মৌলবী সাহেব গনিকে বলিলেন, যখনই তিনি স্কুল দেখিতে আসিবেন, তখন তাহাকে সঙ্গে আনিবেন। এইরূপে গনিকে বিদায় করিয়া কেফাতুল্লা মনে করিল, তাহার ঘাড় হইতে একটা বোঝা নামিয়া গেল।

ছয়

গনি মৌলবী সাহেবের সঙ্গে জেলার সদরে আসিয়া একটা হাই স্কুলে ভর্ত্তি হইল। প্রথম প্রথম নূতন যায়গায় আসিয়া তাহার মন অস্থির হইল, পরে স্কুলে নূতন সঙ্গী পাইয়া পড়ার উৎসাহে ও খেলার আমোদে সে বাড়ীর কথা ভুলিয়া গেল। মৌলবী সাহেবের স্ত্রীর ছেলে হয় নাই,

একটিমাত্র শিশু কন্যা। তিনি গনিকে পুত্রের ন্যায় যত্ন করিতে লাগিলেন। ইহাতে সে তাহার মাতার অভাবও কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইল। মৌলবী সাহেব বৎসরের মধ্যে দুইবার রসুলপুরের ডাকবাংলায় গিয়া স্কুল পরিদর্শন করিতেন। তখন তিনি গনিকে সঙ্গে লইয়া যাইয়া তাহার মাকে দেখাইয়া আনিতেন। গনি ভদ্রলোকের গৃহে থাকিয়া ভদ্রলোকের ছেলের মত শিক্ষিত হইতেছে দেখিয়া ফুলজানের কত আনন্দ হইত। এইরূপে ৫ বৎসর অতীত হইল। গনি অসাধারণ মেধাবী ও পরিশ্রমী বলিয়া ৩ বার ডবল প্রমোশন পাইয়া প্রবেশিকা দিল এবং বিভাগের মধ্যে প্রথম হইয়া মাসিক ১৫৲ টাকা বৃত্তি পাইল। মৌলবী সাহেব এই সময়ে বিভাগীয় সহকারী ইন্‌স্পেক্টারের পদ প্রাপ্ত হইয়া ঢাকায় বদলী হইলেন। গনি তাঁহার সঙ্গে ঢাকায় গিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইল। সে বি, এ, পরীক্ষা দিলে মৌলবী সাহেব তাহার সহিত তাঁহার একমাত্র কন্যার বিবাহ দিলেন।

গনি গত ৩।৪ বৎসর তাহার মাকে দেখিতে যায় নাই। তাহার কারণ, তাহার মা কেফাতুল্লার সংসারে থাকিয়া যে ভাবে জীবন যাপন করিত, তাহা তাহার নিতান্ত অসহ্য বোধ হইত। সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহার মাতার দাসীত্ব মোচন করিতে না পারিলে সে আর মাকে দেখিতে যাইবে না। এ দিকে কেফাতুল্লার ঔরসে ফুলজানের আর দুইটি ছেলে হইয়াছে, ফুলজান তাহাদিগকে লইয়া সুখে দুঃখে দিন কাটাইতেছে।

মৌলবী সাহেব গনির বিবাহের সময় কেফাতুল্লাকে গনির মাকে লইয়া আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ফুলজান বলিল,—"আমার ছেলে বেঁচে থাকুক, সে রাজ্যিশ্বর রাজা হউক, আমি চাষার মেয়ে চাষার বৌ, আমি ভদ্রলোকের বাড়ীতে লজ্জা দিতে ও লজ্জা পাইতে যাব না। গনির যদি কখনও সাধ হয়, তবে আমাকে তার বৌকে আনিয়া দেখাইবে।"

গনির পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল, সে ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। তখন মৌলবী সাহেব তাহাকে কলিকাতায় প্রেসীডেন্সী কলেজে এম, এ, পড়িতে পাঠাইলেন, এবং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী পরীক্ষা দিতে বলিলেন। গনি এম, এ, পরীক্ষা দেওয়ার পূর্ব্বেই প্রতিযোগী পরিক্ষায় প্রথম হইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে নিযুক্ত হইল।

সাত

এক দিন বেলা ১০টার সময় কেফাতুল্লা তাহার বাড়ীর বাহিবের উঠানে ধান মলিতেছিল। সে দেখিল, একটি সাহেবের সঙ্গে এক জন লাল পাগড়ীওয়ালা ও অনেকগুলি চৌকীদার তাহার বাড়ীর দিকে আসিতেছে। কিছু দিন হইল, সে গয়াজদ্দীর সঙ্গে একটা জমীর ধান কাটা লইয়া হাঙ্গামা করিয়া গয়াজদ্দীর মাথা ফাটাইয়া দিয়াছিল। গয়াজদ্দী থানায় কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া সদরে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করিয়াছিল। তদবধি কেফাতুল্লা শঙ্কিত হইয়া আছে, কোন্ সময়ে তাহার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হয়। সে এখন মনে করিল, ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সদলবলে আসিতেছেন। সে অমনই তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটা ধানের গোলার মধ্যে আত্মগোপন করিল। এ দিকে সেই সাহেব, দফাদার ও চৌকীদারগণ সহ আসিয়া তাহার উঠানে দাঁড়াইল। তাহার গায়ের রঙ খুব ফর্সা, হ্যাট-কোট, কলার, নেক্‌টাই প্রভৃতি দ্বারা সে আগাগোড়া সজ্জিত। দফাদার হাঁকিল, "কেফাতুল্লা বাড়ী আছ? ও ভাই কেফাতুল্লা! ডেপুটী সাহেব তোমার বাড়ী আসিয়াছেন।"

কিন্তু কোথাকার কেফাতুল্লা কোথায়? একে ত সে আসামী, তাহার বাড়ীতে স্বয়ং ডেপুটী সাহেব আসিয়াছেন। সে কোন্ সাহসে তাঁহার সম্মুখীন হইবে?

দফাদারের ডাকের উত্তরে বাড়ীর মধ্য হইতে কে একটি স্ত্রীলোক বলিলেন, "সে বাড়ী নাই।"

ডেপুটী সাহেব ইংরেজী ভাষার "Not at home" কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে হাসিলেন।

দফাদার বলিল, "বাড়ীতে কে আছ, বসবার জন্য একটা কুরসী কি মোড়া বাহির করিয়া দেও।"

ডেপুটী সাহেব বলিলেন, "না, সে সবের দরকার নাই। আমি ঐ কাছারী ঘরের চৌকীর উপর বসিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি কাছারী-ঘরে তক্তপোষের উপর বসিলেন এবং স্যুট্‌কেশ খুলিয়া কাপড়-চোপড় বাহির করিয়া সাহেবী পোষাক ছাড়িয়া এক জন মুসলমান ভদ্রলোকের বেশ পরিধান করিলেন।

এই সকল দেখিয়া বাড়ীর মধ্যে কানাকানি চলিতে লাগিল এবং একটু পরেই কেফাতুল্লা বাহিরে আসিয়া "হুজুর, আদাব" বলিয়া করযোড়ে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। ডেপুটী সাহেব তাহাকে সেলাম করিয়া পাশে বসিতে বলিলেন, কেফাতুল্লা বসিতে সাহস করিল না।

ডেপুটী সাহেব বলিলেন, "আমাকে চিনিলেন না? আমি গনি। মা-জী কোথায়?"

ফুলজান অদূরে দাঁড়াইয়া বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিতে ছিল। সে অমনই দৌড়াইয়া ঘরের মধ্যে আসিল এবং "বাপজান্, এই যে আমি! এত দিনে তোর দুখিনী মারে মনে পড়ল? আয়, আমার কোলে আয়" বলিয়া সে গনিকে জড়াইয়া ধরিল। গনিরও চোখে জল আসিল।

কেফাতুল্লা হতভম্ব হইয়া এই কাণ্ড দেখিতেছিল। এতক্ষণে তাহার মুখ ফুটিল। সে ফুলজানকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "আলো মাগী, কি করিস্? হুজুরের গায়ে যে তোর হাতের গোবর-কাদা লাগল।"

গনি হাসিয়া বলিল—"লাগুক, লাগুক। আমি অনেক দিন মা'র কোলে যাই নাই।"

কেফাতুল্লা বলিল, "হুজুর, আপনি যে কত বড় লোক, ও মাগী তা কি বোঝে?"

গনি বলিল, "মা-বাপের কাছে ছেলে চিরদিনই ছোট। মা আপনি এত ব্যস্ত হবেন না। মা, কাল রাত্রিতে আমার কিছু খাওয়া হয় নাই, এখন কিছু খেতে দেও।"

কেফাতুল্লা অমনই এক লাফ দিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল এবং গনির খাওয়ার যোগাড় করিতে লাগিল। সে নিজে একটা ভাণ্ড হস্তে করিয়া গাভী দোহন করিতে গেল এবং বাজার হইতে মাছ কিনিয়া আনিবার জন্য এক জন চৌকীদারের উপর হুকুম জারি করিল। এবার তাহাকে পায় কে? সে ডেপুটী সাহেবের বাপ! সে মনে মনে ভাবিল, গয়াজদ্দীর ধড়ে কয়টা মাথা, তাহা সে এবার দেখিয়া লইবে। সে ডেপুটী সাহেবের বাপ! সে বাড়ীর বাহির হইয়া প্রতিবেশীদিগের মধ্যে প্রচার করিয়া দিল, তাহার পুত্র আবদুল গনি ওরফে গনি মিঞা ডেপুটী সাহেব অনেকগুলি "পুলুষ" লইয়া তাহার বাড়ীতে আসিয়াছে। গ্রামবাসী সকলে সাবধান! এই সংবাদ শুনিয়া অনেক কৌতূহলী কৃষক ডেপুটী সাহেবকে দেখিতে আসিল এবং দূরে দাঁড়াইয়া সভয়ে সেলাম করিল।

গনি আহারাদির পর বিশ্রাম করিতেছিল। তাহার মা আসিয়া তাহার কাছে বসিল। গনি ফুলজানকে বলিল, সে অনেক দিন যাবৎ মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়া আছে, তাহার একান্ত ইচ্ছা, তাহার মা এখন

গিয়া তাহার সঙ্গে থাকেন। সে আর তাহার মা'র কষ্ট দেখিতে পারে না।"

ইহার উত্তরে ফুলজান বলিল—"বাপজান, তুই যে তোর দুঃখিনী মাকে মনে রাখিয়াছিস, ইহাতেই আমি সুখী। আমার আর এখন কোন কষ্ট নাই। আমি চাষার মেয়ে, চাষার বৌ, আমি এই চাষার বাড়ীতেই বেশ আছি। এখানে তোর যে আর দুইটা ভাই হইয়াছে, তাদের নিয়ে আমি এখানেই থাকিব। তবে মধ্যে মধ্যে তোমাদিগকে দেখিয়া আসিব।"

অবশেষে মাতা-পুত্র পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, গনির পৈতৃক ভিটায় কেফাতুল্লা চাষ দিয়া বেগুণের ক্ষেত করিয়াছিল, গনি সেখানে একটা বাড়ী করিবে এবং তাহার মা সেখানে গিয়া বাস করিবে। কেফাতুল্লাও ইহাতে সম্মত হইল। কিন্তু গয়াজদ্দীর মোকদ্দমায় যখন তাহার তিন মাস জেল হইল, তখন সে গনির উপর রাগ করিয়া ফুলজানকে বলিল—"তোর প্যাটের ছাওয়াল ত. ও ডেপুটী হউক আর জজই হউক, ওর তিন পয়সারও মুরাদ নাই।"

কুন্দলতার পত্র

(গল্প নহে)

এক

কলিকাতা
৭ই ভাদ্র।

প্রাণের সই সুষমা!

ভাই, আজ সাত দিন তুমি চলিয়া গিয়াছ, ইহার মধ্যে কি একখান' চিঠিও দিতে পারিলে না? আমি যে প্রত্যেক দিন ডাক আসার সময়ে তোমার চিঠির অপেক্ষায় বসিয়া থাকি। তোমার প্রিয়তমের সঙ্গ পাইয়া আমাকে ভুলিবেই ত! কিন্তু আমি যে তোমাকে দিনের মধ্যে অন্তত: একবার না দেখিলে থাকিতে পারি না। আমার কথা কি একটুও ভাবিবে না? আমি তোমা ছাড়া হইয়া কি লইয়া থাকিব? বোন্, তোর পায়ে পড়ি, ফেরত ডাকে চিঠি লিখিস্। ইতি—

তোমার স্নেহের "কুঁদি।"

দুই

কলিকাতা
১৪ই ভাদ্র।

প্রাণের সই "সু"—

আজ আমি সকালে কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম, জানি না

তোমার মধুমাখা চিঠি পাইয়া মনটা ভারী খুসী হইল। তুই ভারী দুষ্টু! আমার আবার প্রিয়তম কে? তুই ত জানিস্, আমার ধনুর্ভঙ্গ পণ— আমি মা-বাবাকে বিপন্ন করিয়া কখনই বিবাহে রাজি হইব না। তাঁহারা জোর করিলে, আমি স্নেহলতার পথ ধরিব।

ভাই, দাদার কি আক্কেল! আমি আজ বৈকালে চিঠি লিখিতে বসিয়াছি, তিনি একপাল বন্ধু বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, "কুঁদি, এদের চা দিতে হবে।" মা তখন লতীদের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিলেন, আমি ঘরে একলা। কি করি, চা ও জলখাবার লইয়া আমাকে তাহাদের সম্মুখে আসিতে হইল। দাদা আমার পরিচয় দিয়া বলিলেন, "এটি আমার বোন্ কুন্দলতা, এবার ম্যাট্রিক পাশ করেছে।" এই কথা বলিতেই সেই পাঁচ জোড়া চোখ আমার পানে কটমট করিয়া চাহিয়া রহিল— যেন আমাকে গিলিতে চায়। আমি ত লজ্জায় মরিয়া গেলাম। এই কি এদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা? ছি! আজ আর সময় নেই, এখানে ইতি—

তোমার স্নেহের "কু।"

তিন

কলিকাতা

২৫শে ভাদ্র।

প্রাণের সই "সু"—

এবার চিঠি লিখিতে এত দেরী হইল কেন? ভাই, সে দিন আমি কি কুক্ষণে দাদার বন্ধুদের চা' দিতে গিয়াছিলাম। তাহাদের মধ্যে একজন ফস্ করিয়া তাহার মনের ক্যামেরাতে আমার একটা ফটো

তুলিয়া লইয়াছে দেখিতে পাইতেছি। দাদার সঙ্গে তাহার এমন ভীষণ ভাব হইয়াছে, প্রায় রোজই আমাদের বাড়ীতে তাঁহার সঙ্গে বেড়াবে বলিয়া আসে, আর হাঁ করিয়া দরজার পানে তাকাইয়া থাকে। আমি কিন্তু তাহার ত্রিসীমায়ও যাই না। আমি তফাতে তফাতে থাকিয়া তাহার কাণ্ড দেখি আর হাসি। দাদা কাল মাকে বলিতেছিলেন, সে না কি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উজ্জ্বল রত্ন, এম-এ-তে ফার্ষ্ট হইয়াছে, তাহার বাপ এক জন বড় উকীল। আমাদের গরীবের ঘরে এ সব রত্নের আগমন কেন হয়, বুঝি না। কালিদাস শকুন্তলা নাটকে লিখিয়াছেন, যে রত্ন, লোকে তাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে (মৃগ্যতে)। যাক এ সব বাজে কথা। তোমার হৃদয়-রত্নটির কথা তুমি কিছুই লেখ না কেন? তোমার খোকাকে আমার স্নেহের চুমো দিবে। ইতি—

তোমার স্নেহের "কু।"

চার

কলিকাতা

২৯শে ভাদ্র।

প্রাণের সই "সু"—

এবার খুব শীঘ্র চিঠির জবাব দিয়াছ, সে জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু তোমার লজিক্ (Logic) ত খুব আশ্চর্য্য! এবার তোমাকে একটা "ন্যায়রত্ন", "ন্যায়বাগীশ" গোছের উপাধি দিতে হবে। যেহেতু, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের "রত্নটি" আমাকে খুঁজিতেছেন; সুতরাং আমিও একটি "রত্ন" হইলাম, কারণ, কালিদাস বলিয়াছেন,—রত্নকেই লোকে খোঁজে। আমি রত্ন নই, কোন রত্ন-ফত্নর ধারও ধারি না। কাল রাত্রিতে দাদা মাকে বলিতেছিলেন, "কমলের বাপ (সেই রত্নটির নাম কমল) তার বিয়ের

জন্য মেয়ে খুঁজিতেছেন, কমল না কি তার মাকে বলিয়াছে, আমি এখন বিয়ে করিব না। তার মানে, সে সব মেয়ে তাহার অপছন্দ। তাহার বাপ উকীল মানুষ, তাঁহার টাকার খাঁই মস্ত।” মা দাদাকে বলিলেন,—“তবে তিনি বোধ হয় টাকার লোভে খুঁজে খুঁজে কালো মেয়ে দেখিতেছেন। এমন সোনার কার্ত্তিক ছেলে, সে ত কালো মেয়ে অপছন্দ করবেই।” সোনার কার্ত্তিক হউক, আর লোহার কার্ত্তিক হউক, আমাকে এ সব কথা শুনিতে হয় কেন? আর সেই কার্ত্তিকই বা ঘন ঘন এ বাড়ীতে আসেন কেন? আমি সে কার্ত্তিককে দেখিতে চাই না। তুই ভাই, দাদাকে একটু লিখিতে পারিস্? আজ তবে আসি—

তোর “কু।”

পাঁচ

কলিকাতা

৫ই আশ্বিন।

প্রাণের সই “সু”—

এ তোমার ঘোর অবিচাব। তুমি দু’শ মাইল দূর হইতে কি করিয়া আমার মনের কথা বুঝিতে পারিলে যে, আমিই সেই “লোহার কার্ত্তিক”কে না দেখিয়া থাকিতে পারি না? এ তোমার ভারী অন্যায়। আমি যাহা লিখিব, তুমি তাহার উল্টা অর্থ করিয়া আমাকে জব্দ করিতে চেষ্টা করিবে কেন? “উল্টো বুঝলি রাম।” যাহা হউক, দাদাকে তোমার কিছু লিখিতে হইবে না, আমার ঘাট হইয়াছে।

তোমাকে আজ একটা নূতন খবর দিতেছি। আমাদের স্কুলের টিচার (teacher) ইন্দিরা দিদির বিবাহ। তিনি এত কাল পুরুষজাতিকে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছেন, এখন এই ত্রিশ বছর বয়সে প্রেমের ফাঁস গলায়

পরিতেছেন, খুব মজা কিন্তু! শুক্রবার তাঁহাকে বিদায়-অভিনন্দন দেওয়ার জন্য স্কুলে একটা সভা হইবে, আমারও নিমন্ত্রণ হইয়াছে। আমি ত পাশ করিবার পর এই চার মাসের মধ্যে স্কুলঘরের চৌকাঠ মাড়াই নাই। আমাকে লইয়া টানাটানি কেন? তাহার কারণ আছে, আমাকে না কি গান গাইতে হইবে। আজ এই পর্য্যন্ত।

তোমার স্নেহের "কু।"

ছয়

কলিকাতা
৯ই অশ্বিন।

প্রাণের সই "সু"—

কাল ইন্দিরাদির "রঘুনন্দন" সভায় গিয়াছিলাম। খুব গ্র্যাণ্ড্ হইয়াছিল। স্কুলের হলঘর সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। মেয়েরা সাজগোজ করিয়া আসিয়াছিল—যেন এক একটি প্রজাপতি। আমাদের গরীবের ঘরের সাজ কোথা হইতে ভাল হইবে? আমি আমার নীলাম্বরী ঢাকাইখানা পরিয়া গিয়াছিলাম। ইন্দিরা-দি বলিলেন,—'কুন্দ, তোরও দেখছি বিয়ের ফুল ফুটেছে।' আমি লজ্জায় মুখ ঢাকিলাম। আমি, মিনতি, প্রীতি ও সুলেখা এই চারিজনে কোরাসে বিদায় সঙ্গীত গাইলাম। আমাকেই ইন্দিরা-দির গলায় "বিদায় মলিকা" পরাইতে হইল, তখন খুব চটাপট হাততালি পড়িল। অবশেষে মিষ্ট মুখ করিয়া 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হইল।

কিন্তু ভাই, সন্ধ্যা ৭টায় বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখি, দাদার বড় জ্বর হইয়াছে, খুব ছট্‌ফট্ করিতেছেন। আমি অমনই কাপড় ছাড়িয়া পাখা হাতে করিয়া তাঁহার পাশে বসিলাম। আজ সেই 'লোহার

কার্ত্তিক' খুব জব্দ হইয়াছেন। তিনি না কি আসিয়া দাদার কাছে বসিয়াছিলেন এবং দুই একটা কথা বলিয়াই চলিয়া গিয়াছেন। তোরা কেমন আছিস্? ইতি—

স্নেহের "কু।"

সাত

কলিকাতা
১৫ই আশ্বিন।

প্রাণের সই "সু"—

আমার কথা পাল্টাইয়া আমাকে জবাব দেওয়াটা তোর একটা রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে দেখিতেছি। আমি লিখিলাম, "লোহার কার্ত্তিক জব্দ হইয়াছেন,"—তাহার উত্তরে তুই লিখিয়াছিস্—জব্দ আমিই হইয়াছি, কেন না, সেই কার্ত্তিকের সঙ্গে আমার সে দিন চারি চোখের মিলন হয় নাই। তুই যদি এ রকম বেয়াড়া রকমের ইঙ্গিত করিস্, তবে আর আমি তোকে তাহার কথা কিছু লিখিব না।

কিন্তু ভাই, কাল এক কাণ্ড হইয়াছে। দাদার জ্বরটা ছাড়িতেছে না, বুঝি বা রেমিটেণ্টে (remittent) দাঁড়ায়। কাল বৈকালে তাঁহার শরীরের উত্তাপটা কমিয়া আসিতেছিল, আমি পাশে বসিয়া বেদানা ছাড়াইয়া খাওয়াইতেছিলাম, এমন সময়ে "সত্য বাবু কেমন আছেন?" বলিতে বলিতে সেই 'লোহার কার্ত্তিক' ঘরে ঢুকিলেন। কি রকম বেয়াড়া লোক দেখ ত ভাই, খবর নাই, বার্ত্তা নাই, অমনই ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। আমি পলাইবার পথ না পাইয়া জড়সড় হইয়া দাদার পাশে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলাম। দাদা তাহাকে পাশের চেয়ারে বসিতে বলিয়া আমাকে বলিলেন,—"ও কি কুঁদি, তুই লজ্জাবতী লতাটির মতন জড়সড় হয়ে পড়লি

কেন? এই কি তোর ব্রাহ্ম-বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষা?" পরে সেই কার্ত্তিককে বলিলেন,—"কমল বাবু, এর পরিচয় ত আর একদিনই দিয়াছি, আমার বোন্ কুন্দলতা,—ম্যাট্রিক পাশ ক'রে ঘরে ব'সে আই, এ, পড়ছে।" এই কথা শুনিয়া কার্ত্তিক কপালে দুই হাত ঠেকাইয়া আমাকে ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিলেন আমিও একটু মাথা নাড়িলাম; পরে আমি কি কি বই পড়ি, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বইগুলির নাম করিয়া দাদাকে বলিলাম—"দাদা, এবার তোমার একজন সাথী জুটেছেন, আমি আসি।" এই কথা বলিয়া ছুট দিলাম। যাক—আমি এ সব বাজে কথা লিখিয়া তোমাকে ঠাট্টা করিবার সুযোগ দিতেছি; তুই এবার নিশ্চয়ই লিখবি—"এই ত চারি চোখের মিলন হয়েছে!"

দাদার জ্বরটার জন্য ভারী ভাবনা হইয়াছে, ভাই। তোদের কুশল লিখিস্। ইতি—

তোর স্নেহের "কু"

আট

কলিকাতা
৩০শে আশ্বিন।

প্রাণের সই "সু"—

আজ দশ দিন তোর চিঠি পাইয়াছি. সময়াভাবে জবাব দিতে পারি নাই। দাদার জ্বর টাইফয়েডে দাঁড়াইয়াছে। আমাকে সর্ব্বদা তাঁহার পাশে বসিয়া সেবা করিতে হয়। তাঁহার অবস্থা খুব-ই খারাপ হইয়াছিল, ঈশ্বরের কৃপায় আজ দুই দিন একটু ভালোর দিকে যাইতেছে। তোমাদের সেই "সোনার কার্ত্তিক" রোজই আসেন, আর ২।৩ ঘণ্টা

দাদার কাছে বসিয়া থাকেন। তিনি দাদার সঙ্গে নানা গল্প জুড়িয়া দেন, আমাকেও মধ্যে মধ্যে দুই একটা কথা বলিতে হয়। লোকটি কিন্তু অনেক পড়াশুনা করিয়াছেন। দাদা আমাকে বলিলেন,—'কুঁদি, তোর ইংরাজী বইয়ের যখন যা' বোঝবার দরকার, কমল বাবুকে জিজ্ঞেস করিস।' কার্ত্তিক বলিলেন—"আমি most gladly আপনাকে help কববো।" কাল আমি Enoch Ardenএর কয়েকটা passageএর মানে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি বেশ বুঝাইয়া দিলেন। সংস্কৃতেও বেশ জ্ঞান আছে। আমি শকুন্তলার কথা পাড়িতেই মস্ত এক লেকচার দিলেন, জার্ম্মেণীর মহাকবি গেটে নাকি বলিয়াছেন, শকুন্তলা স্বর্গ মর্ত্ত্য এক সূত্রে গাঁথিয়াছে। ধন্য কবি কালিদাস! গেটের প্রশংসাবাক্য শুনিয়া আমার বুকটা দশ হাত ফুলিয়া উঠিল। দাদাকে এখন ঔষধ খাওয়াইতে হইবে, তবে এখন আসি।

তোর স্নেহের "কু"

নয়

কলিকাতা
৫ই কার্ত্তিক।

প্রাণের সই "সু"—

তুমি আমাকে সাবধান করিয়াছ, কেন না, সেই "লোহার কার্ত্তিক" আমার চোখে এখন "সোনার কার্ত্তিক হইয়াছেন, আর আমি তাঁহাকে মাষ্টার মহাশয়ের আসনে বসাইয়াছি। আমার জন্য তোমার কুছপরোয়া নেই। দাদার জ্বরটা কাল একুশ দিনে ছাড়িয়াছিল, আজ আবার একটু হইয়াছে। ডাক্তার বলিলেন, আর কোন ভয় নেই, তবে সারিতে এখনও সময় লাগিবে। কার্ত্তিক পূর্ব্ববৎ আসিতেছেন। দাদা বলিলেন,

তাঁহার বাপ নাকি তাঁহাকে দশ হাজার টাকায় বেচিতে চান, তিনি পশুর মতন নগদ টাকায় বিক্রয় হইতে চান না। তোমরা কেমন আছ? ইতি—

তোমার "কু"

দশ

কলিকাতা
১৪ই কার্ত্তিক।

প্রাণের সই "সু"—

দাদার সাত দিন জ্বর হয় নাই, তিনি অন্ন পথ্য করিয়াছেন। ডাক্তার বলিয়াছেন, দাদাকে লইয়া কোন healthy stationএ (স্বাস্থ্যনিবাসে) changeএ (বায়ুপরিবর্ত্তনে) যাওয়া দরকার। বাবা দেওঘরে তাঁহার এক বন্ধুকে একটা বাড়ীর কথা লিখিয়াছেন, যদি বাড়ী পাওয়া যায়, তবে শীঘ্রই আমরা সেখানে যাইব। এবার সোনার কার্ত্তিক খুব জব্দ হইবেন। সত্য বলিতে কি ভাই, আমারও পড়াটা যেভাবে চলিতেছিল, তাহার খুব ক্ষতি হইবে। আজ তবে আসি। ইতি—

তোর "কু"

এগার

দেওঘর,
৩রা অগ্রহায়ণ।

প্রাণের সই "সু"—

আজ আমরা দশ দিন দেওঘরে আসিয়াছি। জায়গাটা আমার ভাল লাগিতেছে। চারিদিকে খোলা মাঠ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, শুকনা

খটখটে। দাদার এই কয় দিনেই শরীর বেশ সারিয়া উঠিয়াছে। তিনি এখন অল্প অল্প হাঁটিতে পারেন। আমি ত খুব বেড়াই। এখানে মেয়েদের পর্দ্দা নাই। ভাল কথা, তোমাদের সেই "সোনার কার্ত্তিক" কাল এখানে আসিয়াছেন। তাঁহাদের এখানে নিজের বাড়ী আছে। তাঁহার আবার এখন হাওয়া পরিবর্ত্তনের কি দরকার হইল? কাল দাদাকে বলিতেছিলেন, বাড়ীতে বিবাহ করিবার জন্য বড় পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়াছে, সে জন্য পলাইয়া আসিয়াছেন। আমাকে বলিলেন, আপনার পড়া আবার চলুক, আমার এখানে খুব ফুরসুত আছে। কাল আমাদের সঙ্গে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তোরা একবার এখানে আয় না, খুব মজা হবে। ইতি—

তোর "কু"

বার

দেওঘর
১০ই অগ্রহায়ণ।

প্রাণের সই "সু"—

তুমি লিখিয়াছ, সোনার কার্ত্তিক আমার শনি গ্রহের মত আমার পশ্চাতে ধাওয়া করিয়াছে। তিনি শনি কি মঙ্গল, জানি না, তবে তিনি এখানে আসাতে আমার পড়াটা চলিতেছে ভাল। আর আমাদের তিন জনের সাহিত্য-চর্চ্চাও খুব জমিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার বাঙ্গলা সাহিত্য ভাল রকম পড়া আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনর্গল মুখস্থ বলিতে পারেন। কাল হেমচন্দ্রের "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে" কবিতাটি চমৎকার আবৃত্তি করিলেন। তোমাদের এখানে আসা

হইবে না জানিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। দাদা সবল হইলে আমরা একদিন তপোবন দেখিতে যাইব। এখানে season (মরশুম) আরম্ভ হইয়াছে, বিস্তর বাঙ্গালী স্ত্রীপুরুষ দেখিতে পাই, এটা যেন বাঙ্গালা দেশের colony (উপনিবেশ)। আজ এখানে ইতি—

তোমার "কু"

তের

দেওঘর
১৮ই অগ্রহায়ণ।

প্রাণের সই "সু"—

তুমি ইঙ্গিত করিয়াছ, আমরা দুইজনে প্রেমে পড়িয়াছি। তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, তোমাকে এবার আমি ভাঁড়াইব না। কাল আমরা তিন জন মিলিয়া তপোবন দেখিতে গিয়াছিলাম। ছোট একটি পাহাড়, গাছপালায় ঢাকা, বড় সুন্দর যায়গা। আমরা গাড়ী করিয়া পাহাড়ের তলদেশে নামিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। দাদা বেশী দূরে যাইতে পারিলেন না; একখানা পাথরের উপর বসিয়া পড়িলেন। আমি উপরে উঠিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তিনিও পশ্চাতে আসিতেছেন। একটু ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। একটা বন্য বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়াছি। বাতাসটা বড় মিঠা লাগিতেছিল। সহসা আমার মাষ্টার মহাশয় আমার পানে চাহিয়া বলিলেন—"কুন্দ, তুমি আমার হবে?" আমি কি বলিব, ভাবিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া রহিলাম। আমার বড় লজ্জা করিতে লাগিল। তিনি তখন আমার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"তোমাকে প্রথম যে দিন দেখে, সেছিলামই অবধি আমি

মনে একদিনও শান্তি পাই নাই। আমি তোমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারি না, সেই জন্য আমি এই দেওঘরে ছুটিয়া আসিয়াছি। দোহাই তোমার, তুমি "না" বলিও না, তা হ'লে আমি মারা যাব।" আমি এবার আত্মসংবরণ করিয়া বলিলাম, "আপনার বাবার কথা একবার স্মরণ করুন। আমরা নিতান্ত গরিব, আমরা টাকা কোথায় পাইব?" তিনি গদগদ কণ্ঠে বলিলেন—"দেখ কুন্দ, আমি এখন নাবালক নই, আমার বয়স হয়েছে, আমি লেখাপড়া শিখিয়াছি, আমি কি আর এখন বাপ-মায়ের আঁচল ধরিয়া চলিব? কখনও না। আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন, আমি বাবার কথামত যাকে তাকে বিয়ে করিতে পারিব না।" আমি বলিলাম,—"কিন্তু আপনি বাপ-মা ছাড়িয়া কি থাকিতে পারিবেন? তাঁরা যদি আমাকে গ্রহণ না করেন?" "তুমি সে ভাবনা ভাবিও না। তাঁরা যদি গ্রহণ না করেন, আমি তোমাকে লইয়া স্বাধীন ভাবে থাকিব।" "বিবাহ কখন্ হইবে?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "গন্ধর্ব্বমতে আজই, যেমন দুষ্মন্ত-শকুন্তলার হয়েছিল।" এই বলিয়া তিনি পকেট হইতে দুইটি ফুলের মালা বাহির করিয়া একটি আমার গলায় পরাইয়া দিলেন, আমিও তাঁহার পীড়াপীড়িতে কম্পিতহস্তে অপর মালা-গাছটি তাঁহার গলায় পরাইয়া দিয়া আমরা দুইজনে বাবা বৈদ্যনাথের উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। ভাল করিলাম কি না, বুঝিতে না পারিয়া স্পন্দিত হৃদয়ে নীচে নামিয়া আসিলাম। তিনি আমার হাত ধরিয়া তদবস্থায় দাদার কাছে গিয়া নমস্কার করিলেন। আমিও নত হইয়া দাদার পদধূলি লইলাম। দাদা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"কমল, এ কি করিলে, শেষ রক্ষা করিতে পারিবে ত?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "খুব পারিব। তুমি সে ভয় করিও না।" ইহার পরে আমরা বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। ভাই, বিধাতা আমাকে এত সুখ দিবেন, তাহা স্বপ্নের অগোচর। তাই

সময় সময় বড় ভয় হয়—কপালে যেন কি আছে। আমার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিও। ইতি -

তোমার স্নেহের "কু"

চৌদ্দ

দেওঘর

২৬শে অগ্রহায়ণ।

প্রাণের সই "সু"

ভাই, আমার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সাত দিন আগে তোমায় চিঠি লিখিয়াছিলাম, এই সাত দিন তাঁহার সঙ্গ আমাকে কি আনন্দই দিয়াছে! কিন্তু আমার পোড়া কপালে এত সুখ সহিবে কেন? "তে হি নো দিবসা গতাঃ।" কাল প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই তিনি আমাদের বাড়ীতে আসিলেন, আসিয়া আমাদের সঙ্গে বসিয়া চা খাইতেছেন, এমন সময় বাহির হইতে কে এক জন ভীমগর্জ্জনে ডাকিল, "কমল! কমল! কমল এখানে?" তিনি শশব্যস্তে বাহির হইলেন এবং এক স্থূলাকার বৃদ্ধের সহিত ঘরে ঢুকিয়া দাদাকে বলিলেন, "সত্য, আমার বাবা এসেছেন।" দাদা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বৃদ্ধকে নমস্কার করিয়া বসিতে দিলেন, আমি পলাইয়া অন্য ঘরে যাইলাম। বৃদ্ধ ক্রোধভরে বলিলেন—"কমল, আজ প্রায় একমাস হ'ল, তুমি বাড়ী থেকে এসেছ, তা একখানা চিঠি লিখেও কি খবরটা দিতে নেই? তোমার খবর না পেয়ে তোমার মা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছেন, আমিও কাজকর্ম্ম ফেলে তোমাকে খুঁজতে বেরিয়েছি। ব্যাপারখানা কি বল ত?" তিনি কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। বৃদ্ধ আবার বলিলেন,—"তোমাকে না লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছি, এই কি তোমার ধর্ম্ম?" পরে দাদার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন,—"বাপু, তোমাদের সঙ্গে আমার

কোন দিন পরিচয় নেই, কিন্তু তোমাদেরই বা এ কি রকম ব্যবহার ? এই আইবুড়ো সোমত্ত মেয়ে দিয়ে আমার ছেলেকে ভুলিয়ে এখানে এনে রেখেছ ? তোমরা হিন্দু না খৃষ্টান ?” দাদা কোন জবাব দিবার পূর্ব্বে বৃদ্ধের পুত্র বলিলেন,—“বাবা, যা বলবেন, আমাকে বলুন, ওঁদের কোন দোষ নেই। আমি এই সত্যবাবুর ভগিনীকে বিবাহ করব ব’লে এখানে এসেছিলাম, তিনি এখন আমার বাগ্‌দত্তা পত্নী।” এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—“কি বল্‌লি—বাগদত্তা ? আমি না তোর বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে রেখেছি, এই ৩০শে তারিখে বিয়ে ? তুই নিতান্ত নেমকহারাম, পাজী ! আমার সঙ্গে চালাকি ? উঠে আয় ! এখুনি আমার সঙ্গে যেতে হবে—ওঠ্।” এই বলিয়া বৃদ্ধ রোষকষায়িত-লোচনে পুত্রের দিকে তাকাইলেন, তাঁহার পুত্র নিতান্ত কাঁদো-কাঁদো ভাবে যন্ত্রচালিতের ন্যায় তাঁহার পশ্চাদ্‌গমন করিলেন। আমি পাশের ঘরে বসিয়া এই সব কাণ্ড দেখিয়া হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলাম। দাদা আস্তে আস্তে আমার কাছে আসিয়া বসিলেন, কাহারও মুখে কোন কথা নাই। আমার মাথায় যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল। এক ঘণ্টা পরে দাদা ঘুরিয়া আসিয়া জানাইলেন,—তিনি তাঁহার বাবার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছেন। ভাই, এই ত অবস্থা। আমরা এখান হইতে শীঘ্র কলিকাতা যাইব। ইতি—

তোর হতভাগিনী বোন্ “কু”।

পনের

নবদ্বীপ

৩রা চৈত্র।

প্রাণের সই “সু”—

আজ চারি মাস হইল, তোকে শেষ চিঠি লিখিয়াছিলাম। ‘তুই

এর মধ্যে কত চিঠি লিখিয়াছিস্, আমি মনের দুঃখে চুপ করিয়াছিলাম। আর এ কালামুখ লইয়া কাহারও কাছে দাঁড়াইতে ইচ্ছা হয় না। আমার দুঃখ এখন চরম সীমায় উঠিয়াছে। তুই আমার বাল্যসখী, প্রাণের সুহৃদ, তোকে সকল কথা প্রাণ খুলিয়া লিখিলে মনে কতকটা শান্তি পাইব আশা করি। সেই যে "তিনি" দেওঘর হইতে সুশীল ও সুবোধ বালকটির মত বাপের সঙ্গে চলিয়া গেলেন, এ পর্য্যন্ত তাঁহার আর দেখা পাওয়া যায় নাই। তবে তিন খানা চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আশার কথা অনেক ছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার ত কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমার এই জীবনটাকে এরূপ ঘোর অন্ধতমসাচ্ছন্ন করিবার তাঁহার কি অধিকার ছিল? ভাই রে, আমি চন্দনতরু ভ্রমে বিষ-দ্রুমকে আশ্রয় করিয়াছিলাম! তিনি আমাকে বুঝাইয়াছিলেন, নরনারীর মধ্যে স্বভাবের আকর্ষণে যে প্রেমের মিলন হয়, তাহাই প্রকৃত বিবাহ, পূর্ব্বে এই হিন্দু সমাজেই তাহা গান্ধর্ব্ব-বিবাহ নামে প্রচলিত ছিল, পরে নাকি স্বার্থপর ব্রাহ্মণরা নগদ কিঞ্চিৎ লাভের জন্য "মন্ত্রপড়া বিবাহ" প্রচলিত করিয়াছে। আমরা পাশ্চাত্য আলোকপ্রাপ্ত নরনারী সেই সব কুসংস্কার মানিব কেন? এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে—স্বাধীনতা-মন্ত্রের উপাসিকা আমি, তাঁহার কথায় সংযমের বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলাম। কিন্তু হায়! তখন একবারও ভাবি নাই, এই উদ্ভট মত সমাজ মানিবে কেন, আমার পিতা-মাতাই বা মানিবেন কেন? তাই সেই গান্ধর্ব্ব "বিবাহের" ফলে আমাকে এই নবদ্বীপ "মাতৃভবনে" আশ্রয় লইতে হইয়াছে। এখানে আমার ন্যায় আরও কয়েকজন হতভাগিনীকে দেখিলাম। এখানকার বন্দোবস্ত খুব ভাল। কেহ কাহারও পরিচয় জিজ্ঞাসা করে না। এখানকার ম্যানেজার বাবু বড়ই দয়ালু, আমি তাঁহাকে বাবা বলিয়া ডাকি, তিনিও আমাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করেন।

কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ জীবন বড়ই অন্ধকারময়। যখন সে কথা ভাবি, তখন আমি আর আমাতে থাকি না। তিনি কি এই হতভাগিনীকে গ্রহণ করিবেন? শুনিয়াছি, তিনি এখনও বিবাহ করেন নাই, নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার বাপও প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ছেলে তাঁহার অবাধ্য হইলে তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিবেন। তাঁহার জন্য আমার মনে দুঃখ হয়। তিনি উভয়সঙ্কটে পড়িয়াছেন। ধনী পিতার একমাত্র বংশধর, তিনি কি এই হতভাগিনীর জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিবেন? আমি কিন্তু ভাই, প্রাণান্তেও দ্বিচারিণী হইব না। যদি তিনি আমাকে শাস্ত্রমতে গ্রহণ না করেন, তবে আমার জীবন চিরদুঃখেই কাটিবে। বিবাহ কয়বার হয়? আমি ঘোর পাপী, অসংযমী। আমার এই পাপের—ঘোর অসংযমের ফল অবশ্যই ভুগিতে হইবে। তবে তিনি যদি ফিরিয়া আসিয়া আমার পিতামাতার নিকট হইতে আমাকে প্রচলিত বিবাহ-বিধি অনুসারে গ্রহণ করেন, তবেই আমার জীবনে শান্তি পাইব। আমি উদরান্নের জন্য ভাবি না, যেটুকু লেখাপড়া শিখিয়াছি, তাহা দ্বারা একটা চাকুরী জুটাইয়া লইতে পারিব। কিন্তু তাঁহাকে না পাইলে আমি কি প্রকারে বাঁচিব? তিনি কি আমার এই হৃদয়ের বেদনা বুঝিবেন না?

ভাই, আমার জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিস্। তোর হতভাগিনী বাল্যসখীকে ভুলিস্ না। আমি আজ সমাজের কাছে অধঃপতিত, স্বামী দ্বারা পরিত্যক্ত, তুইও কি আমাকে ঘৃণা করিবি?

ইতি—তোমার চিরদুঃখিনী "কু"

সবজজ ও ইন্দুর

এক

বহুদিন পূর্ব্বে রঘুপতি বাবু বেহারের উত্তরপ্রান্তবর্ত্তী এক জেলার সবজজ ছিলেন। সে জেলায় তখন জজ ছিল না, পার্শ্ববর্ত্তী অন্য জেলার জজ আসিয়া দায়রার কার্য্য করিতেন। এই জেলার বাৎসরিক রিপোর্টাদি সবজজের হাত দিয়াই যাইত। বেহারের সকল জেলায়ই তখন নীলকর জমীদারদিগের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল, এখনও তাহার কিছু কিছু আছে। বাৎসরিক রিপোর্টে জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে অনেক বিষয়ের কৈফিয়ৎ (explanation) দিতে হয়, তাহা সময় সময় বড় মজার হয়। জেলায় চুরি-ডাকাতি বাড়িয়াছে কেন, ইহার কারণ ম্যাজিষ্ট্রেট একবার লিখিলেন, দেশে অজন্মা হওয়াতে খাদ্য শস্যাদির মূল্য বাড়িয়াছে, লোকে কিনিয়া খাইতে পারে না, সেই জন্য। আবার অন্য বৎসর, চুরি-ডাকাতি কেন কমিয়াছে, তাহার কারণও লেখা হইল - শস্যাদির মূল্য বাড়িয়াছে বলিয়া কৃষকদের হাতে পয়সা হইয়াছে, সে জন্য লোক বেশী চুরি-ডাকাতি করে নাই। খাজনার নালিশের সংখ্যা কেন বাড়িয়াছে, ইহার কারণ জজসাহেব লিখিলেন—শস্যাদি বেশী না হওয়ায় অনেক প্রজা খাজনা দিতে পারে নাই, সেই জন্য। আবার খাজনার নালিশ যেবার অপেক্ষাকৃত কম দায়ের হইল, সেবারও কৈফিয়ৎ দেওয়া হইল—ফসল কম হওয়াতে প্রজাদের অবস্থা খারাপ হইয়াছে, নালিশ

করিয়াও কিছু আদায় হইবে না দেখিয়া জমীদারগণ বেশী মোকর্দ্দমা দায়ের করে নাই। মোট কথা, কি জজ, কি ম্যাজিষ্ট্রেট, হাতের কাছে অন্য কৈফিয়ৎ খুঁজিয়া না পাইলে ফসল হওয়া না হওয়াই সকল বিপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু রঘুপতি বাবু এইরূপ মামুলি কৈফিয়ৎ না দিয়া, তাঁহার জেলায় খাজনার মোকর্দ্দমা কমিয়া যাওয়ার কারণ লিখিলেন—নীলকর জমীদারদের অত্যাচারে অনেক প্রজা ভিটামাটী ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে, সেই জন্য খাজনার নালিশের সংখ্যা কমিয়াছে। এই রিপোর্ট যখন উপর-ওয়ালাদের হাতে পৌঁছিল, তখন এক তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইল, কমিশনার সাহেবের আসন নড়িল, তিনি ইহার তদন্ত করিতে আসিলেন।

রঘুপতি বাবু একদিন প্রাতর্ভ্রমণ শেষ করিয়া আসিয়া রায় লিখিতে বসিয়াছেন। তাঁহার ঘরে টেবলের উপর স্তুপাকার নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ সাজান রহিয়াছে। তিনি সেই সকল কাগজপত্র তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছেন। তাঁহার সম্মুখস্থ ঘড়ীতে যখন আটটা বাজিল, তখন কালেক্টার সাহেবের এক চাপরাশী একখানা চিঠি লইয়া আসিল। কালেক্টার মিঃ গ্রিন (Mr. Green) তাঁহাকে লিখিয়াছেন, কমিশনার সাহেব তাঁহার সঙ্গে ৯টার সময় দেখা করিতে চান, তিনি যেন ঐ সময়ে কালেক্টারের কুঠিতে আসেন। রঘুপতি বাবু ধড়া-চূড়া পরিয়া যথাসময়ে যাত্রা করিলেন। তাঁহার গৃহিণী বলিলেন,— "একেবারে খেয়ে গেলে হ'তনা? ফিরে আস্‌তে অনেক দেরি হ'তে পারে।"

তিনি বলিলেন—"খাওয়া আমার মাথায় থাক, ব্যাপার কি একবার দেখে আসি।"

দুই

রঘুপতি বাবু কালেক্টার সাহেবের কুঠীতে যাইয়া কমিশনারের নিকট কার্ড পাঠাইয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার তলব হইল। কমিশনার মিঃ বাটলার (Mr. Butler) খুব বুড়া হইয়াছেন, মাথায় টাক, দাড়ি-গোঁফকামান, গোলগাল চেহারা। সবজজ বাবু আসিলে তিনি হাসি-মুখে হাত বাড়াইয়া দিয়া "Good morning, how do you do?" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার করমর্দ্দন করিলেন এবং তাঁহাকে সম্মুখস্থ একখানা চৌকিতে বসিতে বলিলেন। রঘুপতি বাবু সেখানে উপবেশন করিলেন। পরে তাঁহাদের মধ্যে যে কথোপকথন হইল, নিম্নে তাহার অনুবাদ দিলাম।

কমি।—আপনি এ জেলায় কত দিন আছেন, রঘুপতি বাবু?

রঘু।—এই দুই বছর।

কমি।—এ যায়গার স্বাস্থ্য কেমন? আপনাকে কেমন মানাইয়াছে?

রঘু।—হাঁ; ভালই—আমার কোন অসুবিধা নাই।

কমি।—আপনি কত দিন সবজজের কার্য্য করিতেছেন?

রঘু।—আট বৎসর। আমার আর বেশী বিলম্ব নাই, আর এক বছর পরেই আমার রিটায়ার করিবার সময় আসিবে।

কমি।—কেন, আপনার স্বাস্থ্য ত বেশ ভাল দেখা যাইতেছে, আপনি ইচ্ছা করিলে আরও তিন বছর কাজ করিতে পারেন।

রঘু।—সে উপরওয়ালাদের অনুগ্রহ।

কমি।—আপনাকে বোধ হয় এখানে খুব বেশী খাটিতে হয়?

রঘু।—আজ্ঞে হাঁ। আমার এখানে কেহ সাহায্যকারী নাই। তবে এ ছোট জেলা, আমি এর চেয়ে বড় জেলায়ও কায করিয়া আসিয়াছি।

কমি।—এখানে মোকর্দ্দমার সংখ্যা বাড়িতেছে না

রঘু।—আজ্ঞে, Title suit (স্বত্বের মোকর্দ্দমা) এখানে বেশী হয় না. Rent suit (খাজনার মোকর্দ্দমা) আর money suit (দেনা-পাওনার মোকর্দ্দমা) ই বেশী। Money suit বড় কমে না, Rent suit পূর্ব্বাপেক্ষা কমিতেছে।

কমি।—কি জন্য কমিতেছে, বলিতে পারেন?

রঘু।—তাহার কারণ আমি যতদূর বুঝিতে পারি, নীল-কর জমীদারগণ আগে অনেক বেশী খাজনার মোকর্দ্দমা দায়ের করিত, কতক দিন হইল, তাহারা বেশী মোকর্দ্দমা দায়ের করে নাই। তাহাদের এলাকার অনেক রায়ত নাকি এ জেলা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

কমি। কেন চলিয়া গিয়াছে, বলিতে পারেন?

রঘু।—নীলকরদিগের অত্যাচারে।

এই কথা শুনিয়া কমিশনারের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—"অত্যাচারে আপনি কিরূপে বুঝিলেন?"

রঘু।—আপনি কালেক্টার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন, এ জেলার নীলকরদিগের সহিত প্রজাদের অনেক দিন হইতে strained relation (মনোমালিন্য) চলিতেছে, আমার কাছে যে সকল মোকর্দ্দমা হইয়াছে, তাহাতেও আমি বুঝিযাছি।

কমি।—কিন্তু প্রজারা ত এত দিন গ্রাম ছাড়িয়া পলায় নাই, এখন পলাইল কেন?

রঘু।—তাহাদের জমী, বাড়ী সব নীলকররা নীলাম করিয়া লইতেছে, সেই জন্য।

কমি।—আচ্ছা, আমি কালেক্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, চাপরাশী!

একজন চাপরাশী আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। কমিশনার বলিলেন—"কালেক্টার সাহেবকো সেলাম দেও।" "বহুৎ খুব হুজুর"

বলিয়া চাপরাশী কালেক্টার সাহেবের নিকট গেল। কালেক্টার মিঃ গ্রিন (Green) অন্য কক্ষ হইতে আসিলেন। তিনি তালগাছের মত লম্বা, মুখে দাড়ি নাই, গোঁফ দুই দিক্ দিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। রঘুপতি বাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিলেন, সাহেব তাঁহার করমর্দ্দন করিয়া "How do you do ?" বলিলেন, এবং নিজে একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া কমিশনারের পাশে বসিলেন। কমিশনার বলিলেন,

"I say, Green, is it a fact that many raiyats of the Indigo planters are leaving this district ?" (এ জেলার নীলকরদের অনেক রায়ত নাকি এ জেলা ছাড়িয়া যাইতেছে ?)

"Yes, many people migrate to other districts in search of employment" (এ জেলার অনেক লোক কাযের অনুসন্ধানে অন্য জেলায় যায়।)

"But are they leaving this district with their families for good ?" (কিন্তু তারা সপরিবারে চিরদিনের জন্য যাইতেছে কি না ?)

"Yes, I know in some villages, the raiyats have left for good, because they do not find agriculture very profitable now-a-days" (হাঁ, আমি জানি, কোন কোন গ্রামের প্রজারা একবারে চলিয়া গিয়াছে, কারণ, কৃষিকার্য্য এখন বড় লাভজনক নয়।)

"Why not ?" (কেন নয় ?)

"As mice destroy the crops," (কারণ, ইন্দুররা শস্য নষ্ট করে)

এবার কমিশনার সাহেব রঘুপতি বাবুর প্রতি একটি বিজয়দৃপ্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—

"So you see, Roghupati Babu, your surmise is not correct. Will you now modify your remark in the

annual report in the light of the further experience you have gained ?" (রঘুপতি বাবু, আপনি এবার বুঝিলেন, আপনার অনুমান সত্য নহে। এখন আপনি এই অভিজ্ঞতার ফলে আপনার বাৎসরিক রিপোর্টে লিখিত মন্তব্য সংশোধন করিবেন ত ?)

"But, Sir, my own experience is otherwise as I have already told you. I shall however think over the matter" (কিন্তু মহাশয়, আমার নিজের অভিজ্ঞতা অন্যরূপ, তাহা আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তবে আমি এ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিব।)

কমিশনার একটু উগ্রভাবে বলিলেন—

"Good morning."

অর্থাৎ আপনি উঠুন। এবার কমিশনার উঠিয়া দাঁড়াইলেন না, করমর্দ্দনও করিলেন না। রঘুপতি বাবু উভয় সাহেবকে সেলাম করিয়া বিদায় হইলেন।

তিনি বাড়ীতে আসিলে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইল ? কেন কমিশনার সাহেব তোমাকে ডাকিযাছিলেন ?"

তিনি বিমর্ষ হইয়া বলিলেন,—"আর কি হইবে, আমার মাথা আর মুণ্ডু। শালা ইন্দুর আমার সর্ব্বনাশ করিবে দেখিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি গৃহিণীকে সকল কথা বলিলেন।

তিন

উক্ত ঘটনার দুই মাসের পরের কথা। রঘুপতি বাবু পূজার ছুটীতে দেশে গিয়াছিলেন, কাছারী খুলিবার পূর্ব্বদিন সপরিবারে ফিরিয়া আসিতেছেন। মোকামা ঘাটে রেলগাড়ী হইতে নামিয়া, ফেরি ষ্টীমারে

গঙ্গা পার হইয়া, আবার অন্য ট্রেণে উঠিতে হইবে। পূজার ছুটীর পরে কাছারী খুলিবে, গাড়ীতে ও ষ্টীমারে অনেক লোকের ভিড় হইয়াছে। তাহার মধ্যে রঘুপতি বাবুর পরিচিত অনেক লোক আছে, এবং কয়েক জন উকীলও আছেন। রঘুপতি বাবু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে মেয়েদের ষ্টীমারের ক্যাবিনে আগে পাঠাইয়া দিয়া নিজে মালপত্রের ব্যবস্থা করিলেন এবং কুলী বিদায় করিলেন। তাঁহার নিজের ষ্টীমারে প্রথম শ্রেণীর টিকিট ছিল, তিনি সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া ফার্ষ্ট ক্লাস ক্যাবিনের দিকে যাইবেন, এরূপ সময়ে এক জন ইয়ুরেসিয়ান সাহেব তাঁহাকে বাধা দিল। রঘুপতি বাবুর চেহারা কালো, তাঁহার পরিধানে ধুতি এবং কোট। সে সাহেব তাঁহাকে এক জন সাধারণ লোক মনে করিয়া বলিল, "এধার মাৎ আও।" রঘুপতি বাবু ইংরাজীতে বলিলেন, "আমার ফার্ষ্ট ক্লাস টিকিট আছে।"

সাহেব বলিল, "But you do not appear to be a gentleman" (তোমাকে ভদ্রলোক বলিয়া মনে হয় না) এই বলিয়া সাহেব তাঁহার পথ বন্ধ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। রঘুপতি বাবু পাশ কাটাইয়া যাইতে চেষ্টা করিলে সাহেব তাঁহাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল। তাঁহার অনতিদূরে অনেকগুলি বাঙ্গালী ভদ্রলোক দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, কয়েক জন নব্য উকীল "বন্দে মাতরং" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহারা সকলে মিলিয়া সেই সাহেবকে মারিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। রঘুপতি বাবু তাঁহাদিগকে থামাইলেন।

নগেন বাবু উকীল বলিলেন—"কেন মশায়, আপনি সরুন, আমরা ফিরিঙ্গীটাকে একবার দেখিয়া লই। এত বড় আস্পর্দ্ধা যে আপনার গায়ে হাত দেয়?"

রঘুপতি বাবু বলিলেন—"নগেন বাবু, উত্তেজিত হবেন না, থামুন। রাগের মাথায় বে-আইনী কাজ ক'রবেন না।"

"কেন মশায়, থামবো কেন? এ ত আপনার কোর্ট নয় যে, আপনার হুকুমে চ'লব? ঐ ফিরিঙ্গীটা কেবল আপনার নহে, আমাদের বাঙ্গালী জাতির অপমান করেছে। ওকে কিছু উত্তম-মধ্যম দেওয়া দরকার।"

এ দিকে "বন্দে মাতরং" ধ্বনি শুনিয়াই সে সাহেব চম্পট দিয়া এক ক্যাবিনে ঢুকিয়াছিল। সেই স্বদেশীর প্রথম আমলে "বন্দে মাতরং" অনেক সময়ে সাপের মাথায় ধূলা পড়ার ন্যায় কাজ করিত। উকীলবাবুগণ সেখানে যাইয়া তাহাকে মারাটা সুবুদ্ধির কাজ মনে করিলেন না, সুতরাং রঘুপতি বাবুর কথায় নিরস্ত হইলেন। তখন তাঁহারা কয়েক জন মিলিয়া এক প্রসেসন (Procession) করিয়া রঘুপতি বাবুকে একটা প্রথম শ্রেণীর ক্যাবিনে instal (অধিষ্ঠিত) করিয়া আসিলেন। সেই ফিরিঙ্গী সাহেব সভয়ে তাহার ক্যাবিনের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। ঘটনাক্রমে গ্রীন (Green) সাহেব কালেক্টারও সেই ষ্টীমারে ছিলেন, তিনি ডেকের উপর দাঁড়াইয়া এই ঘটনা দেখিলেন।

চার

নদী পার হইয়া ষ্টীমার ওপারে পৌঁছিল। রঘুপতি বাবু পরিবারাদি সহ ষ্টীমার হইতে গাড়ীতে উঠিতে যাইলেন। তাঁহার পুত্র মেয়েদের লইয়া ইণ্টার ক্লাসে উঠিল, তিনি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার পার্শ্ববর্তী ফার্ষ্ট ক্লাস গাড়ী হইতে কালেক্টার গ্রীন সাহেব তাঁহাকে ডাকিলেন। তিনি সাহেবের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য সেই গাড়ীতে আসিলেন, সাহেব তাঁহাকে খাতির করিয়া কাছে বসাইয়া বলিলেন,—

"What was the row about, Raghupati Babu ?" (রঘুপতি বাবু, ও কিসের গোলমাল হইল ?)

রঘুপতি বাবু কালেক্টার সাহেবকে সকল ঘটনা বলিলেন, আরও বলিলেন, তিনি না থামাইলে উকীল বাবুরা ঐ সাহেবকে মারিতেন। গ্রীন সাহেব বলিলেন, "What are you going to do now ? Do you know that the gentleman in question is Mr White, the Executive Engineer ? He did not know you." (আপনি এখন কি করিতে চান ? ঐ সাহেব হইতেছেন মিঃ হোয়াইট, একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার। তিনি আপনাকে চিনিতে পারেন নাই।)

"White or black I don't care, sir. I wish to take legal steps against him." (সে সাহেব হোয়াইট (সাদা) হউক বা কালো হউক, আমি গ্রাহ্য করি না, আমি তাহার নামে মোকর্দ্দমা করিব।)

গ্রীন।—আপনি কি তবে ফৌজদারী মোকর্দ্দমা করিবেন ?

রঘু।—আমাকে তাহাই করিতে হইবে, আমার অনেক সাক্ষী আছে।

গ্রীন।—আপনি যদি আমার পরামর্শ গ্রহণ করেন, তবে ফৌজদারিতে যাইবেন না। আপনি আপনার superior officer (উপরিস্থ কর্ম্মচারী) জজ সাহেবের নিকট রিপোর্ট করুন। তিনি অবশ্য ইহার প্রতীকার করিবেন।

রঘু।—জজ সাহেব আমার যেমন মুরব্বী, আপনিও সেইরূপ মুরব্বী, আমি আপনাদের পরামর্শ অবশ্য শুনিব। আমি শান্তিপ্রিয় লোক। আমি নিবারণ না করিলে ঐ ষ্টীমারের মধ্যেই একটা ফৌজদারী হইত।

গ্রীন।—আমি আপনার ধৈর্য্য ও সুবুদ্ধির প্রশংসা করি। আচ্ছা, আপনি এখন যাইতে পারেন।

রঘুপতি বাবু তাঁহার নিজের কামরায় আসিলেন। গাড়ী ছাড়িবার তখনও কিছু বিলম্ব ছিল। নগেন বাবু প্রমুখ উকিলগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন—

"ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনাকে কি বলিলেন?"

রঘুপতি বাবু বলিলেন,—"সাহেব কি ব্যাপার হইয়াছে জানিতে চাহিলেন, এবং আমি ইহার কি প্রতীকার করিব, তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন।"

নগেন বাবু বলিলেন,—"আপনি অবশ্য ঐ ফিরিঙ্গীটার নামে ফৌজদারী কোর্টে দরখাস্ত দিবেন। দেখুন, আপনি আমাদের সকলের মাননীয় ব্যক্তি। আপনাকে এইরূপে অপমান করিল, ইহা আমাদের কিছুতেই সহ্য হয় না। আপনি নিবারণ না করিলে তখনই আমরা তাহাকে কিঞ্চিৎ নগদ বিদায় দিয়া দিতে পারিতাম। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যাহাই বলুন, আপনি তাহাকে কিছুতেই ছাড়িতে পারিবেন না। ইহা আমাদের বিশেষ অনুরোধ।"

রঘুপতি বাবু বলিলেন—"নগেন বাবু, আমারও সেই অভিপ্রায়, আমি তাহাকে কিছুতেই ছাড়িব না। তবে কি জানেন, আমি ফৌজদারী মোকর্দ্দমাটাকে বড় ভয় করি। যদি অন্য ভাবে—"

নগেন বাবু বলিলেন—"ঐ যা—আপনি সব মাটী করিয়া ফেলিবেন দেখিতেছি। অন্য ভাবে আর কি করিবেন?"

রঘুপতি বাবু বলিলেন—"আমি আগে জজ সাহেবের কাছে রিপোর্ট করিতে চাই, তিনি হইলেন superior officer (উপরিস্থ কর্ম্মচারী), আগে তাঁহার উপদেশ নেওয়াটা উচিত মনে করি। আসামী ত পলাইতেছে না, সে হইতেছে একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার হোয়াইট সাহেব।"

নগেন বাবু।—তা' হো'ক। অত শত করিতে গেলে অনেক বিলম্ব হইবে। ফৌজদারী মোকর্দ্দমা গরম গরম দায়ের না করিলে সুবিধা হয় না। আপনার কোন চিন্তা নাই। আমিই মোকর্দ্দমা চালাইব, আবশ্যক হইলে বারের অন্য উকিলরাও আপনাকে সাহায্য করিবেন; আপনাকে আমরা সকলে যেরূপ শ্রদ্ধা করি, আপনি সকলেরই sympathy (সহানুভূতি) পাইবেন।

আর এক জন উকিল সুবোধ বাবু বলিলেন,—"এটা কেবল আপনার নহে—আমাদের বাঙ্গালী জাতির অপমান—ইহার মধ্যে আমাদের national honour (জাতির সম্মান) জড়িত রহিয়াছে।"

রঘুপতি বাবু বলিলেন,—"আচ্ছা, আমি বিবেচনা করিয়া দেখি।"

এই সময়ে গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা দিল। উকিল বাবুরা অন্য গাড়ীতে গেলেন।

পাঁচ

পরদিন সন্ধ্যার পর রঘুপতি বাবু তাঁহার বাসার বৈঠকখানায় বসিয়া তামাক খাইতেছেন। সেখানে হরেন্দ্র বাবু মুন্‌সেফ ও মতি বাবু ডেপুটীও আছেন। নগেন্দ্র বাবু ও সুবোধ বাবু উকীল সেখানে আসিলেন। রঘুপতি বাবু তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। নগেন্দ্র বাবু বলিলেন—"আপনি তবে কি ঠিক করিলেন?"

রঘুপতি বাবু বলিলেন—"হঠাৎ ফৌজদারীতে নালিশ করাটা সুবিধা-জনক হবে না, আমি জজসাহেবের কাছে রিপোর্ট ক'রে দিয়াছি। দেখি তিনি কি বলেন।"

নগেন্দ্র বাবু একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"আজ্ঞে, আমার বেয়াদপি মাপ ক'রবেন। আপনারা red tapismটাকে বড্ড ভালবাসেন। এটা ত আফিস-সংক্রান্ত কোন বিষয় নয়, এটা আপনার ব্যক্তিগত মান-অপমানের ব্যাপার, জজসাহেবের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক কি?"

সুবোধ বাবু বলিলেন,—"কেবল ব্যক্তিগত নহে, ইহার সহিত আমাদের national question জড়িত রয়েছে। আপনি এক জন বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর পোষাক পরেছিলেন ব'লে ফার্ষ্ট ক্লাসে travel ক'রতে পা'রবেন না, এটা কি কথা? এর একটা প্রতীকার হওয়া একান্ত আবশ্যক।"

মতি বাবু বলিলেন,—"তা ত বুঝলাম, মশাই। ফৌজদারী মোকর্দ্দমা ক'রলে কি সুবিধা হবে?—সাহেবের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা—"

নগেন বাবু বলিলেন,—"মাপ করবেন মশাই—মোকর্দ্দমা যদি আপনার কাছে যায়, আপনি বুঝি তা হ'লে ম্যাজিষ্ট্রেটের ভয়ে মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্ ক'রবেন?"

রঘুপতি বাবু বলিলেন,—"ভয়ে ডিস্‌মিস্ ক'রবেন কেন, উনি যেরূপ প্রমাণ পাবেন, সেইরূপই বিচার ক'রবেন। তবে কথা হচ্ছে এই, নগেন বাবু, ফৌজদারী মোকর্দ্দমা সাহেবের নামে—ঐ ম্যাজিষ্ট্রেটই দেখবেন শেষকালে তার সাফাই হবে।"

হরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"সব শিয়ালের এক ডাক।"

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"তা হো'ক। প্রত্যক্ষ ঘটনা, in broad day light—আমরা সকলেই সাক্ষ্য দিব—সত্যকে মিথ্যা করাটা কি সোজা কথা? আপনি ঘাবড়াবেন না মশাই!"

রঘুপতি বাবু বলিলেন,—"জজসাহেব কি উত্তর দেন, দেখা যা'ক— তখন আমার কর্ত্তব্য স্থির ক'রে আপনাকে জানাব। আপনারা আমার

প্রতি যে সহানুভূতি দেখাচ্ছেন, সে জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।”

সুবোধ বাবু বলিলেন,—“বলেন কি মশাই—এ যে আমাদের national question—”এই বলিয়া উকিলদ্বয় প্রস্থান করিলেন। রঘুপতি বাবুও সভাভঙ্গ দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহার গৃহিণী কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া এই সব কথা শুনিতেছিলেন। তিনি বলিলেন,—“ঐ উকীল বাবুরা বুঝি তোমাকে ফৌজদারী মোকর্দ্দমা ক’রতে বললেন?”

“হাঁ গো হাঁ। কিন্তু শেষটা সেও ধরবে কে?”

“কিন্তু তুমি যাই বল, তুমি কিছু না ক’রলে আমাদের কিন্তু লোকের কাছে মুখ দেখান কষ্ট হবে। তুমি কি কিল খেয়ে কিল চুরি ক’রবে?”

“না, তা’ করবো কেন? জজসাহেবের কাছে সব কথা লিখে দিয়াছি, তিনি উপরওয়ালা--তাঁহাকে না জানাইয়া হঠাৎ কিছু করা উচিত নয়। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও সেইরূপ বলেছেন।”

ছয়

ইহার সাত দিন পরে জজসাহেবের চিঠি আসিল। তিনি লিখিয়াছেন,—

“I learn from Mr. Green who was an eye-witness to the occurrence that you suffered through your own obstinacy. You had no business to force your way into the 1st class compartment when you were prevented by Mr. White. Your friends created a tempest over a

teapot. You will be ill-advised to go to court over this trifling matter."

(আমি মিঃ গ্রীনের নিকট জানিতে পারিলাম যে, তিনি নিজেই ঐ ঘটনা দেখিয়াছিলেন এবং আপনি আপনার নিজের একগুঁয়ামির দরুণ কষ্ট পাইয়াছেন। যখন মিঃ হোয়াইট আপনাকে নিবারণ করিলেন, তখন আপনার জোর করিয়া প্রথম শ্রেণীর কামরার মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করা উচিত হয় নাই। আপনার বন্ধুগণ একটা তিলকে তাল করিয়া তুলিয়াছিল। এই সামান্য বিষয় লইয়া যে আপনাকে নালিশ করিতে পরামর্শ দিবে, আমি তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না।)

এই উত্তর পাইয়া রঘুপতি বাবুর চক্ষুঃস্থির হইল। তিনি আশা করিয়াছিলেন, জজ সাহেব তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া অন্ততঃ হোয়াইট সাহেবকে (apology) ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য করিবেন। কিন্তু এ যে উল্‌টা তাঁহার ঘাড়েই সম্পূর্ণ দোষ চাপাইতেছে। তাঁহার মন নিতান্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। নগেন্দ্র বাবু ফৌজদারী মোকর্দ্দমা রুজু করিবার জন্য তাঁহাকে কাছারীতে তাগাদা করিতে লাগিলেন, আবার এ দিকে বাড়ীতে গৃহিণীও গঞ্জনা দিতে লাগিলেন। বেচারার জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। অবশেষে মোরিয়া হইয়া তিনি এক দিন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে উপস্থিত হইয়া হোয়াইট সাহেবের নামে এক নালিশ দায়ের করিলেন। ডেপুটি তাঁহার এজাহার লিখিয়া লইয়া, কি হুকুম দিবেন, হঠাৎ স্থির করিতে না পারিয়া, অন্য দরখাস্ত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রীন সাহেব জানিতে পারিয়া, সেই দরখাস্ত চাহিয়া পাঠাইলেন, এবং তাঁহার নিজের ফাইলে উহা তুলিয়া লইয়া এইরূপ হুকুম লিখিলেন—"This is a trifling matter. When there is a great rush of passengers in the steamer, such

pushing and hustling is inevitable. No sane man would complain of it. The complaint is dismissed under Sec. 203 Cr. P. C."

(এ অতি তুচ্ছ ব্যাপার। ষ্টীমারে লোকের ভীড় হইলে এরূপ ধাকাধাক্কি না হইয়াই পারে না। কোন্ স্থিরবুদ্ধি লোক এজন্য আবার কোর্টে নালিশ করে? মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্ করা হইল।) সিনিয়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রের গৃহীত নালিশের উপর ম্যাজিষ্ট্রেট অবশ্য আইন অনুসারে এরূপ হুকুম দিতে পারেন না। কিন্তু সেই চারিহাত লম্বা তাল-গাছ আইনের ধার ধারিবেন কেন? আইন প্রস্তুত করিয়াছে, তাঁহার বাপ-দাদারা, না তোমাদের বাপ-দাদারা?

ইহার ১৫ দিন পরে রঘুপতি বাবুর নোয়াখালি জেলায় বদলির হুকুম আসিল। তিনি এই সময়ে বদলী না হওয়ার জন্য একখানা দরখাস্ত লিখিয়া পাঠাইলেন; কারণ, তাঁহার ছেলেরা স্কুলে পড়ে, এ সময়ে বদলী হইলে তাহাদের পড়ার ব্যাঘাত হইবে। জজসাহেব সেই দরখাস্তের উপর এই মন্তব্য লিখিলেন,—

"The sub-judge is fond of playing to the gallery. He has acquired a strong bias against the planters of this district, so he is not expected to decide their cases with anything like fairness. In my opinion he should not be allowed to remain here any longer." (এই সবজজ ইতর লোকের মনস্তুষ্টি করিতে ভালবাসেন। তিনি এ জেলার নীলকর-দিগের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্বেষ পোষণ করেন। সুতরাং তাহাদের মোকর্দ্দমা তিনি নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে অক্ষম। আমার মতে তাঁহাকে এ জেলায় আর রাখা উচিত নহে।)

বলা বাহুল্য, জজসাহেবের এই মন্তব্যের পর তাঁহার বদলীর হুকুম বহাল রহিল। তিনি চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে নোয়াখালি চলিলেন।

নোয়াখালি গিয়া তিনি যাঁহাকে জজ পাইলেন, তিনি সেই নামজাদা জবরদস্ত পারনেল সাহেব (Mr. Parnel)। রঘুপতি বাবু যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, তখন তিনি তাঁহার মুখে সমস্ত কাহিনী শুনিয়া ক্রোধে টেবল চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"What ! is this British justice ? Have we come out to administer this sort of justice in India ? It is these black sheep who are making British rule unpopular." (কি ? ইহাই কি ইংরেজের ন্যায়বিচার ? আমরা কি এ রকম ন্যায়বিচার করিতে ভারতবর্ষে আসিয়াছি ? এই সকল দুষ্ট এড়েঁই এ দেশে ইংরাজের শাসনকে কলঙ্কিত করিতেছে।) পরে তিনি বলিলেন, "আপনি এখনই আমার কাছে এই বদলীর বিরুদ্ধে একটা representation (আবেদন) দিন, আমি তাহাতে সমস্ত ঘটনা লিখিয়া হাইকোর্টে পাঠাইব।"

রঘুপতি বাবু বলিলেন,—"আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু সে দরখাস্তের কোন ফল হইবে না। আমি এখন এখানেই থাকিতে চাই, বিশেষতঃ যখন আপনার ন্যায় ন্যায়পরায়ণ মনিব পাইয়াছি। আর আমার পেনসনের সময় ও হইয়া আসিল।"

"আপনি কবে রিটায়ার করিবেন ?"

"আর ৬ মাস বাদে আমার বয়স ৫৫ বৎসর পূর্ণ হইবে।"

"আপনি একস্‌টেন্‌সনের দরখাস্ত দিবেন। আমি আপনার একস্‌টেন্‌সন্ recommend করিব। আপনার প্রতি বড়ই অবিচার হইয়াছে।"

রঘুপতি বাবু যথাসময়ে ১ বৎসর একস্‌টেন্‌সনের জন্য দরখাস্ত দিলেন। পারনেল সাহেব খুব বিশেষ করিয়া recommend করিলেন। সে কালে সব সবজজই অবলীলাক্রমে ৩ বৎসর একস্‌টেন্‌সন্‌ পাইতেন। তিন বৎসর একস্‌টেন্‌সনের মানে পনের হাজার টাকা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, রঘুপতি বাবুর একস্‌টেন্‌সন্‌ না-মঞ্জুর হইল। তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, হাইকোর্টে তাঁহার একস্‌টেন্‌সন্‌ মঞ্জুর হইয়াছিল, কিন্তু গবর্ণমেণ্টে সেই দরখাস্ত পৌঁছিতেই তাহা পত্রপাঠ না-মঞ্জুর হইয়াছে। তিনি গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো, শুনেছ! আমি যা চাই, তাই হয়েছে। আমার এক মুহূর্ত্তও আর এ চাকুরি করতে ইচ্ছা করে না। কেবল তোমার জেদে পড়িয়া একস্‌টেন্‌সন্‌ চাহিয়াছিলাম। তুমি বললে,—১৫ হাজার টাকা ত সোজা নয়, তিনটা মেয়ে পার করা যাবে। কিন্তু সেই শালার ইন্দুরই এই টাকাগুলির দফা রফা করেছে।"

"সে কেমন?"

"সেই বার্টলার সাহেব—যিনি কমিশনার ছিলেন, তিনিই এখন চিফ্‌ সেক্রেটারি হয়েছেন। তিনি নিজমুখে বলেছিলেন, আমার স্বাস্থ্য যেরূপ, তাহাতে আমি ৩ বৎসর একস্‌টেন্‌সন্‌ পাইতে পারিব। এ সময় তিনিই এখন আমাকে এক বৎসরের একস্‌টেন্‌সন্‌ও দিলেন না। এ সেই ইন্দুরের জন্য, বুঝলে ত। এই ত আমাদের চাকুরী!"

ডেপুটী ও বাঁদর

এক

রাধানগর জেলার সিনিয়ার ডেপুটী সত্যকিঙ্কর বাবু এক দিন বেলা আটটার সময় তাঁহার বাসার বৈঠকখানায় বসিয়া গীতাপাঠ করিতেছিলেন। তিনি দ্বিতীয় অধ্যায়ে পড়িতেছিলেন,—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥"

এবং পড়িতে পড়িতে ইহার অর্থ চিন্তা করিয়া ভাবিতেছিলেন, কর্ম্ম করিতেই তোমার অধিকার আছে, কর্ম্মফলে তোমার কোন অধিকার নাই। কর্ম্মের ফলাফল চিন্তা না করিয়া, কর্ম্মে আসক্তিশূন্য হইয়া, নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে। ইহাই ভগবানের উপদেশ। বড় শক্ত কথা।

এই সময়ে 'সত্যকিঙ্কর বাবু বাড়ী আছেন' বলিতে বলিতে একটি যুবক সেখানে প্রবেশ করিল। তাহার পরিধানে হাফ প্যাণ্ট—কোট—কলার—নেক্‌টাই—হ্যাট্‌, গোঁফের দুই দিকের অগ্রভাগ কামানো, মাথার সম্মুখভাগের চুল খুব লম্বা, পশ্চাদ্‌ভাগে প্রায় কামানো—যেন সেই দিক্ দিয়া কিছু দিন পূর্ব্বে তাহার গুরুদশা হইয়া গিয়াছে।

সত্যকিঙ্কর বাবু গীতা বন্ধ করিয়া বলিলেন—"এস, এস, তরুণ এস। প্রভাতে তরুণতপনের উদয় কি মনে ক'রে ?"

তরুণতপনও এক জন ডেপুটী। সে পার্শ্ববর্ত্তী চৌকীতে বসিয়া বলিল,—"একটা সু-খবর দিতে এলুম। গবর্ণমেণ্ট আমার সেই পিটিসন্ মঞ্জুর করেছেন।"

সত্য বাবু বলিলেন, "কোন্ পিটিসন্? ওঃ—সেই 'মিষ্টার' হওয়ার দরখাস্ত? বেশ বেশ। শুনে খুব খুসী হলেম। তোমার ত মিষ্টার হওয়াই উচিত।"

তরুণ বলিল—"আমার মামা বিলাত-ফেরত, আমি তাঁরই বাড়ীতে মানুষ হয়েছি, আমার মামার ছেলে বিলাত গিয়াছে, আমার এক সম্বন্ধীও বিলাত গিয়াছে।"

সত্য বাবু হাসিয়া বলিলেন,—"তবে ত তোমার মিষ্টার হওয়ার বার্থ রাইট-ই (birth right) রয়েছে। বেশ, আজ থেকে তোমাকে আমরা মিষ্টার ব'লেই সম্বোধন করব। আর তরুণতপন বানার্জ্জী না লিখিয়া Mr. T. T. Banerjee লিখব, কেমন ?"

তরুণ বলিল—"ভাল কথা, আজ ৪টার সময় আমাদের ফুটবল খেলার একটা ম্যাচ আছে। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব খেলা দেখতে যাবেন, আমি তাঁকে invite (নিমন্ত্রণ) ক'রে আস্‌ছি। আমাকে আজ কোন বড় মোকদ্দমা দেবেন না।"

সত্য বাবু বলিলেন—"আচ্ছা, যদি দিই, তবে ছোট একটা দেব। তুমি প্রায়ই বুঝি ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কাছে যাও ?"

তরুণ বলিল--"দরকার পড়লেই যেতে হয়। আচ্ছা, তবে এখন আসি।"

এই বলিয়া তরুণতপন উঠিল। সত্যকিঙ্কর বাবু তাহার ফ্যাসনদুরস্ত ভাব দেখিয়া একটু হাসিলেন।

তিনি আহারাদি করিয়া বেলা১১টার সময় তাঁহার এজলাসে গিয়া বসিয়াছেন, এই সময়ে এক জন আর্দ্দালী আসিয়া সেলাম দিয়া বলিল—"হুজুর, সাহেব সেলাম দিয়াছেন।"

সত্যকিঙ্কর বাবু তখন উঠিলেন এবং মাথায় টুপী পরিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠিতে যাইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জাডকেল (Mr. Zadkiel) সাহেব তাঁহার আফিস-ঘরে বসিয়া ফাইল (file) দেখিতেছিলেন। এক জন চাপরাশী পাশে দাঁড়াইয়া ঝুড়ি (basket) হইতে এক একটা লালফিতায় বাঁধা কাগজের বাণ্ডিল খুলিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিতেছিল, আর সাহেব সেই কাগজে আমলা ও ডেপুটীর লেখা নোট (note)এর উপর দ্রুতবেগে চক্ষু বুলাইয়া তাহার পাশে Yes, No, Very good, I agree, ইত্যাদি হুকুম লিখিতেছিলেন। ইহার নাম file clear (ফাইল ক্লিয়ার) করা। কোন জটিল বিষয়ে মাথা ঘামাইবার ফুরসুত তাঁহার নাই; তিনি জানেন, উপরে উপরে সোটা ঘুরাইতে পারিলেই "সরকারী কাম্ আপসে চল্ যায়েগা"। সত্যকিঙ্কর বাবুর কার্ড পাইয়া তিনি আর্দ্দালীকে বলিলেন—"বাবুকো সেলাম দেও।"

সত্যকিঙ্কর বাবু আসিয়া গুড মর্ণিং বলিয়া সেলাম করিলে সাহেব একটা ফাইল হইতে চোখ তুলিয়া "Good morning, Satya Babu, sit down please" বলিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিলেন এবং আবার সেই ফাইল দেখিতে লাগিলেন। পরে সত্য বাবুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—

"You see, Satya Babu, here is a note submitted by the Land Registration Deputy Collector. He says that his file is too heavy, and he wants somebody else to assist him. But I don't understand why should the Land Registration work be so heavy when there are so

many Sub-Registrars in this district." (সত্য বাবু, আপনি দেখুন, নামজারির ডেপুটী কালেক্টার বলেন, তাঁহার ফাইলে অনেক বেশী কায, তিনি আর একজন সাহায্যকারী চান; কিন্তু এ জেলায় এতগুলি সব-রেজিষ্ট্রার থাকিতে, নামজারির ফাইলে বেশী কায হইবে কেন, আমি বুঝি না।)

সত্যকিঙ্কর বাবু কালেক্টার সাহেবের বিদ্যার দৌড় দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন। তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন —

"Sir, the Sub-Registrars only register deeds, they have nothing to do with Land Registration cases, which are dealt with by a Deputy Collector at Sadar." (সবরেজিষ্ট্রাররা কেবল দলিল রেজিষ্ট্রী করেন, নামজারি মোকদ্দমার সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই; সে সব মোকদ্দমা সদরে এক জন ডেপুটী কালেক্টার নিষ্পত্তি করেন।)

সাহেব এবার নিজের মূর্খতা বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইয়া বলিলেন-- "Oh, I see. Who can assist him ?" (আমি এবার বুঝিলাম। তাঁহাকে কে সাহায্য করিতে পারে ?)

সত্য বাবু বলিলেন—"A Sub-Deputy Collector may dispose of a good many uncontested cases." (এক তরফা মোকদ্দমার অনেকগুলি এক জন সব-ডেপুটী করিতে পারেন।)

সাহেব বলিলেন,—"All right. I order Debendra Babu, Sub-Deputy Collector to assist him." (ঠিক কথা, আমি দেবেন্দ্র বাবু সব-ডেপুটী কালেক্টারকে সাহায্য করিবার হুকুম দিলাম।)

এই বলিয়া সাহেব হুকুম লিখিয়া ফাইলটা চাপরাশীর হাতে দিয়া তাহাকে যাইতে বলিলেন। চাপরাশী চলিয়া গেলে তিনি সত্যকিঙ্কর

বাবুর দিকে ঘুরিয়া বসিয়া ইংরাজীতে যাহা বলিলেন, তাহার ভাবার্থ এই—

"এখন যে জন্য আপনাকে ডাকিয়াছি, সেই কথা বলি। আমি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, আমার খানসামা আবদুলকে থানার দারোগা গত রাত্রে মদ খাইয়া রাস্তায় মাতলামি করার অভিযোগে চালান দিয়াছে। এটা অত্যন্ত অসম্ভব ব্যাপার (simply preposterous)। আমি তাহাকে কখনও মাতাল দেখি নাই। এখন এই মোকদ্দমাটা আপনিই বিচার করিবেন, এই আমার অভিপ্রায়। আপনি এখন যাইতে পারেন।"

এই বলিয়া সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং সত্য বাবু কোন কথা বলিবার আগেই গোছলখানায় চলিয়া গেলেন। সত্য বাবু নিতান্ত বিমর্ষচিত্তে কাছারীতে আসিলেন। গীতার সেই বাক্য তাঁহার মনে হইল, "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" অমনই তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন।

তিনি এজলাসে আসিয়া বসিতে কোর্ট সব-ইন্‌স্পেক্টার তাঁহার খাতা-পত্র ও মোকদ্দমার নথি লইয়া আসিলেন। দুইটা চার্জ্জসিট আসিয়াছে, একটা হাঙ্গামা মোকদ্দমা, আর একটা সেই খানসামার বিরুদ্ধে পাঁচ আইনের মোকদ্দমা। সত্যকিঙ্কর বাবু প্রথমটি নিজের ফাইলে রাখিয়া দ্বিতীয়টির উপর হুকুম লিখিলেন--"To Mr. T. T. Banerjee for disposal." (মিঃ টি, টি, ব্যানার্জ্জিকে নিষ্পত্তির জন্য দেওয়া হইল)। লিখিবার সময় একবার হাত কাঁপিল, অমনি আর একবার ভগবদ্‌বাক্য স্মরণ করিলেন, "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" আবার ডেপুটী তরুণতপনকে মিঃ লিখিয়া মনে একটু হাসিও আসিল।

তরুণতপনের এজলাসে সেই পাঁচ আইন মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইলে, ৪।৫ জন কালেক্টারের চাপরাশী আসামীর পাশে আসিয়া

দাঁড়াইল। তিনি প্রথমে একটু ভড়কাইয়া গেলেন, পরে কোর্ট সাব-ইন্‌স্পেক্টারের নিকট আসামীর পরিচয় পাইয়া বুঝিলেন, আসামী আর কেহ নহে, সাহেবের পেয়ারের খানসামা আবদুল। তখন কর্ত্তব্য স্থির করিতে তাঁহারও বেশী সময় লাগিল না। মোকদ্দমায় মাত্র এক জন সাক্ষী ছিল, অর্থাৎ যে কনষ্টেবল আসামীকে মাতাল অবস্থায় ধরিয়াছিল, সেই কনষ্টেবল। পুলিস এই সকল মোকদ্দমায় বেশী সাক্ষী পাঠায়ও না; কারণ, প্রায়ই আসামীরা অপরাধ স্বীকার করিয়া।০, ॥০ জরিমানা দিয়া চলিয়া যায়। এ ক্ষেত্রে আসামী খোদ কালেক্টার সাহেবের খানসামা, সে অপরাধ স্বীকার করিবে কেন? সুতরাং সে বলিল, "হুজুর, আমি নির্দ্দোষ, ঐ কনষ্টেবল আমার কাছে ঘুষ চাহিয়াছিল, তাহা না দেওয়ায় আমাকে মিথ্যা করিয়া চালান দিয়াছে।" কনষ্টেবল প্রমাণ দিল যে, সে আসামীকে রাস্তায় মাতাল অবস্থায় ধরিয়াছিল, তখন অন্য লোকও উপস্থিত ছিল, থানায় লইয়া গেলে সেখানেও তাহার মুখে মদের গন্ধ ছিল ও সে মাতলামী করিয়াছিল, তাহা থানার জমাদার বাবু জানেন ইত্যাদি। কিন্তু তাহার কথার পোষকতা করিবার জন্য অন্য সাক্ষী উপস্থিত না থাকায়, হাকিম তাহার কথা অবিশ্বাস করিয়া আসামীকে খালাস দিলেন।

ফুটবল খেলার মাঠে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে তরুণের দেখা হইলে সাহেব তাঁহাকে congratulate (সাদর সম্ভাষণ) করিলেন। সত্যকিঙ্কর বাবুর উপর অবশ্য রুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু মোকদ্দমার ফল সন্তোষজনক দেখিয়া সে রাগ প্রকাশ না করিয়া চাপিয়া রাখিলেন। যে দারোগা আবদুল খানসামাকে চালান দিয়াছিল, সে মফঃস্বলের এক থানায় বদলী হইল।

দুই

ইহার ছয় মাসের পরের কথা। Mr. T. T. Banerjee অর্থাৎ তরুণতপন যথার্থই "rising sun" (উদীয়মান রবি)। করিমপুর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী ছুটীর দরখাস্ত দেওয়ায়, মিঃ জ্যাডকেল সাহেব তরুণতপনকে নিযুক্ত করিবার জন্য recommend (সুপারিশ) করিয়া পাঠাইলেন। তাহার ফলে মিঃ টি, টি, ব্যানার্জ্জী করিমপুর মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া কার্যভার গ্রহণ করিলেন।

করিমপুর মহকুমার অন্তর্গত কমলাপুরের বিখ্যাত জমীদার অমরেন্দ্র বাবু এক দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি একটা প্রকাণ্ড রোহিত-মৎস্য ও অন্যান্য অনেক আহার্য্য জিনিষ ভেট লইয়া আসিয়াছেন। মাছ দেখিয়া মিঃ ব্যানার্জ্জী মহা খুসী হইলেন; কারণ এত বড় মাছ তিনি কখনও দেখেন নাই। তিনি জমীদার বাবুকে ড্রইং-রুমে খুব আপ্যায়িত করিয়া বসাইলেন। কুশল-প্রশ্নাদির পরে জমীদার বাবু বলিলেন—

"হুজুর, আমার একটা বিশেষ নিবেদন আছে। রথযাত্রার সময় আমাদের বাড়ীতে কিছু আমোদ-উৎসব হয়, গ্রামে একটা মেলা বসে, তাহা ৭ দিন পর্য্যন্ত থাকে। আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবরা সেই সময়ে অনুগ্রহ করিয়া পদধূলি দিতেন, ঐ ৭ দিন তাঁহারা সেখানে ক্যাম্প করিতেন। সেখানে থাকার কোন অসুবিধা নাই, একটা ডাক-বাংলো আছে। আমার বিশেষ অনুরোধ, হুজুরও সেখানে সেই সময় যাইয়া মেলায় কয় দিন ক্যাম্প করিবেন এবং আমার বাড়ীতে পদধূলি দিবেন।"

মিঃ ব্যানার্জ্জী হাসিয়া বলিলেন, "তা' যেতে পারি। আপনারা কিরূপ আমোদ-উৎসব করেন?"

জমীদার বাবু বলিলেন— "কলিকাতা থেকে একটি ভাল ঢপ আনা হবে, আর আমাদের একটা থিয়েটার পার্টি আছে তারা প্লে করবে।"

মিঃ ব্যানার্জ্জী বলিলেন—"আচ্ছা, ঢপ কাকে বলে ? ঢপ মানে বোধ হয় মোটা মেয়ে মানুষ, অর্থাৎ যাদের বয়স বেশী ও শরীর মোটা ব'লে নাচতে পারে না কেবল ব'সে ব'সে গান করে, তাই না ?"

জমীদার বাবু হাসিয়া বলিলেন— "কতকটা তাই বটে, অর্থাৎ যারা ঢপ গায়, তারা সাধারণতঃ একটু প্রবীণ, তবে সকলে মোটা হয় না, আর তারা নাচে না, কেবল কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কীর্ত্তন গান করে।"

মিঃ ব্যানার্জ্জী বলিলেন,—"অমরেন্দ্র বাবু, কৃষ্ণলীলা শোনবার মতন বয়স আমার এখনও হয় নাই, তা' অবশ্য দেখতেই পাচ্ছেন।"

অমরেন্দ্র বাবু বলিলেন— "হুজুর যদি ইচ্ছা করেন, তবে খেমটা নাচের ও ব্যবস্থা করতে পারি।"

মিঃ ব্যানার্জ্জী বলিলেন— "আচ্ছা, তবে তাই করবেন। আমি আপনাদের গ্রামে গিয়ে তিন দিন ক্যাম্প করব। আমার পকেট্-ডায়রিতে তারিখ নোট ক'রে নিচ্ছি।"

অমরেন্দ্র বাবু বলিলেন—"রথযাত্রার দিন হচ্ছে ২৪শে আষাঢ়, ৮ই জুলাই।"

মিঃ ব্যানার্জ্জী তারিখ নোট করিয়া লইলেন, এবং জমীদার বাবু বিদায় গ্রহণ করিলেন। এই জমীদার বাবুর মহকুমার হাকিমকে পরিতুষ্ট করার বিশেষ কারণ ছিল। তাঁহার সরিক হরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে তাঁহার মামলা-মোকদ্দমা প্রায় লাগিয়াই আছে।

যাহা হউক, ক্রমে সেই ৮ই জুলাই আসিল। মিঃ ব্যানার্জ্জী তাহার পূর্ব্বদিনে সদল-বলে সেই ডাক-বাংলোয় আসিয় অধিষ্ঠান করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে তিনি থানার দারোগাকে সঙ্গে করিয়া মেলার স্থান দেখিতে বাহির হইলেন। এই মেলাতে অনেক দূরের দোকানদারেরা আসিয়া ঘর বাঁধিয়া, বেচাকেনা করে, ৭ দিন পর্য্যন্ত বহু লোকের সমাগম হয়। মেলাভূমির খাজনা জমীদারদের একটা মস্ত লাভের উপায়। সে খাজনা আদায়ের ভার হাজারি বিশ্বাস নামক এক জন ইজারাদারের উপর। হাকিম সাহেব মেলার স্থান দেখিয়া দারোগাকে বলিলেন—"Why no sanitary arrangemnents ? Call the Ijaradar." (স্বাস্থ্য-রক্ষার বন্দোবস্ত হয় নাই কেন? ইজারাদারকে তলব করুন)। আধ-ঘণ্টা পরে ইজারাদার কাঁপিতে কাঁপিতে হাজির হইল. কিন্তু হাকিম সাহেব তাহার সহিত দেখা করিলেন না। পরে দারোগা তাহাকে কাণে কাণে কি বলিলেন, এবং সে ১৫ মিনিটের মধ্যে ১ মণ চাউল, আধমণ ময়দা, দশ সের ঘি, ইত্যাদি জিনিষের এক মস্ত ডালি সাজাইয়া আনিয়া দেখা করিতে আসিল। তখন হাকিম সাহেব ডাক-বাংলো হইতে বাহির হইয়া আসিয়া হাসিমুখে তাহাকে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে এক লেক্‌চার দিয়া বিদায় দিলেন।

সে দিন সন্ধ্যার পর জমীদার বাবুর বাড়ীর প্রাঙ্গণে গানের আসর বসিল। প্রকাণ্ড সামিয়ানার তলে প্রায় হাজার লোক সমবেত হইয়াছে। সন্ধ্যা ৮টার সময় কলিকাতা হইতে সমাগত কুসুমকুমারী নাম্নী নাচওয়ালীর নাচগান আরম্ভ হওয়ার কথা। মিঃ ব্যানার্জ্জী সাহেব নাচ দেখিতে আসিবেন বলিয়াছেন। জমীদার বাবু স্বগণ-সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। কিন্তু রাত্রি ৯টা বাজিল তবু নাচওয়ালীর দেখা নাই। তাহার সঙ্গীয় বাদ্যকরগণ আসিয়া আসরে বসিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। জমীদার বাবু তাহার বাসায় পুনঃ পুনঃ লোক পাঠাইতেছেন, কিন্তু সে কোথায় কেহ বলিতে পারে

না। অবশেষে রাত্রি সাড়ে ৯টার সময় সে আসরে আসিল, তাহার সঙ্গে হাকিম সাহেবের আর্দ্দালী আলো ধরিয়া আসিয়াছে। সে আসরে আসিয়া একটু পরেই গান ধরিল।

কুসুমকুমারী দেখিতে সুন্দরী, বয়স অনুমান ২০ বৎসর! তাহার গলার স্বরও সুমিষ্ট। অল্পক্ষণের মধ্যেই গান জমিয়া গেল। ইতিমধ্যে ব্যানার্জ্জী সাহেব কোন্ সময়ে আসিয়া আসরের এক পার্শ্বে একটা চেয়ারে বসিয়াছেন, তাহা জমীদার বাবু ভিন্ন বড় কেহ লক্ষ্য করে নাই। কুসুমকুমারী দাঁড়াইয়া গাহিতেছিল,—

সখি, যমুনাপুলিনে বাঁশী বাজাইছে শ্যাম,
বাঁশীর রবে আকুল হ'লো আমার এ পরাণ,
(ও সখি, আমার এ পরাণ)—

"আমার এ পারাণ"—"আমার এ পরাণ" বলিতে বলিতে যখন সে নৃত্য আরম্ভ করিল—অমনই—ঐ দেখ, কে এক জন ফিরিঙ্গী-বেশধারী লোক উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া. সঙ্গে সঙ্গে নাচা সুরু করিতেই, জমীদার বাবু ধাঁ করিয়া উঠিয়া তাহাকে যেন ছোঁ মারিয়া লইয়া গেলেন। দর্শক-মণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই ইহা লক্ষ্য করিবার অবসর পাইল না। নাচওয়ালী একটু হতভম্ভ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু পরক্ষণেই সামলাইয়া লইল। জমীদার বাবু হাকিম সাহেবকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার বৈঠকখানায় শোয়াইয়া দিলেন।

পরদিন বেলা ৫টার সময় ঢপগান আরম্ভ হইল, রাত্রি ৯টার পর নাচ হইবে। সন্ধ্যার পর কুসুমকুমারী ডাকবাংলোয় যাইয়া ব্যানার্জ্জী সাহেবকে গান শুনাইবে। সন্ধ্যা ৭টা বাজিল, মিঃ ব্যানার্জ্জী তাহার অপেক্ষায় একাকী বসিয়া আছেন। কতকক্ষণ পরে একটি লোক একটা হার্ম্মোনিয়াম রাখিয়া গেল। আজ কুসুমকুমারী নিজে হার্ম্মোনিয়াম

বাজাইয়া গান গাইবে। পরক্ষণেই সুরম্য বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া এসেন্‌সের গন্ধ ছড়াইতে ছড়াইতে কুসুমকুমারী আসিল। মিঃ ব্যানার্জ্জী তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার পাশে একখানা চেয়ারে বসিতে দিলেন। কুসুমকুমারী বলিল—

"কাল আপনি একটু বেচাল হয়ে পড়েছিলেন; ব্রাণ্ডী খাওয়া বুঝি আপনার অভ্যাস নেই?"

মিঃ ব্যানার্জ্জী একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"বেশী খাওয়া ঘটে উঠে না. বাড়ীতে স্ত্রীর বড় কড়া শাসন।"

কুসুম হাসিয়া বলিল,—"তাই নাকি? হুজুরের উপরেও হুজুর আছেন দেখছি। তা' হ'লে এখন আরম্ভ করা যা'ক।"

এই কথা শুনিয়া মিঃ ব্যানার্জ্জী টেবলের তলায় যে বোতল ছিল, তাহা উপরে তুলিয়া, তাহা হইতে একটু গেলাসে ঢালিয়া ও সোডা মিশাইয়া কুসুমকুমারীর হাতে দিলেন। কুসুম অল্প এক চুমুক খাইয়া তাঁহার হাতে গেলাস দিল, তিনি সবটুকু এক নিশ্বাসে খাইয়া ফেলিলেন। কুসুম তখন হার্ম্মোনিয়ামে সুর দিয়া এই গান ধরিল :—

বঁধু মম চিত্ত-চকোর তব বদন-সুধাকর
অমিয় পিয়াসী হে,—

গানের মাত্র এই দুইটি পদ গাওয়া হইয়াছে, এই সময়ে বাহিরে পাল্কী-বেহারাদের কোলাহল শুনা গেল, এবং সেই পাল্কী ডাক-বাংলোর হাতার মধ্যে প্রবেশ করিল। মিঃ ব্যানার্জ্জী তাঁহার সঙ্গিনীর গানে এতদূর তন্ময় হইয়াছিলেন যে, তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই। পরমুহূর্ত্তেই একটি স্ত্রীলোক পাল্কী হইতে অবতরণ করিয়া তাড়াতাড়ি বারান্দায় উঠিলেন। ব্যানার্জ্জী সাহেবের আর্দ্দালী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া দৌড়াইয়া আসিল এবং সাহেব কোথায় জিজ্ঞাসা করায় সেই কক্ষ দেখাইয়া দিল। তখন

তিনি খুব জোরে ধাক্কা মারিয়া দরজা খুলিয়া ফেলিলেন। মিঃ ব্যানার্জ্জী "কে—কে" বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সম্মুখে সেই উগ্রচণ্ডা-মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার চক্ষুস্থির হইল। "অ্যাঁ—অ্যাঁ, তুমি যে হঠাৎ এলে"—বলিয়া তিনি তাঁহার স্ত্রীকে সম্ভাষণ করিলেন। কুসুমকুমারী গান বন্ধ করিয়া বসিয়া রহিল, নড়িল না। মিসেস্ ব্যানার্জ্জী ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"তুমি মফঃস্বলে এসে বুঝি এইরূপ ঢলাঢলি করছ? তোমার লজ্জাসরম একেবারেই নেই?"

ব্যানার্জ্জী সাহেব কি বলিবেন, কিছুই খুঁজিয়া পাইলেন না। কুসুমকুমারী সপ্রতিভভাবে বলিল,—"আপনি বোধ হচ্ছে সাহেবের স্ত্রী—তা' এতে দোষ কি? আপনি শিক্ষিতা রমণী, নির্দ্দোষ সঙ্গীতচর্চ্চা হচ্ছে—"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জী ক্রোধভরে বলিলেন,—

"আমি তোমাকে কিছু বলছি না—তুমি এখনই বেরিয়ে যাও। গানের আসরে বেশ্যার হাত ধ'রে নাচা কেমন নির্দ্দোষ সঙ্গীতচর্চ্চা, তা' আমি বিলক্ষণ জানি! ছিঃ ছিঃ! আমার গলায় দড়ি দিয়া মরতে ইচ্ছা হচ্ছে!"

তাঁহার মার-মূর্ত্তি দেখিয়া কুসুমকুমারী আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল। ব্যানার্জ্জী সাহেব টলিতে টলিতে পার্শ্ববর্ত্তী খাটে শুইয়া পড়িলেন।

তিন

এই ঘটনার ১৫ দিন পরে মিঃ ব্যানার্জ্জী কালেক্টার মিঃ জ্যাডকেলের এক ডেমি-অফিসিয়াল চিঠি পাইলেন, কালেক্টার ৩ দিন পরে মহকুমা পরিদর্শন করিতে আসিবেন, মিঃ ব্যানার্জ্জী যেন তাঁহার আহারের বন্দোবস্ত করেন। তিনি মিঃ জ্যাডকেলের ভাবগতিক বিলক্ষণ জানিতেন।

তিনি কয়েক জন জমীদারের মোক্তারকে বলিয়া দিলেন, সাহেব যে কয় দিন মহকুমায় থাকিবেন, তাঁহাকে প্রত্যেক দিন যেন এক একটি ডালি দেওয়া হয়।

নির্দ্দিষ্ট দিন বেলা ১০টার সময় মিঃ জ্যাডকেন্স আসিয়া পৌছিলেন। মিঃ ব্যানার্জ্জী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নিজের কুঠিতে লইয়া গেলেন। সেখানে মিসেস্ ব্যানার্জ্জীও তাঁহার যথোচিত সমাদর করিলেন। তাঁহার ভ্রাতা বিলাত গিয়াছেন, সুতরাং তিনিও সাহেবী আদব-কায়দা অনেকটা শিখিয়াছিলেন। মিঃ ব্যানার্জ্জীও তাঁহাকে ইংরেজী কথাবার্ত্তা কিছু কিছু শিক্ষা দিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া "ব্রেক-ফাষ্ট" করিলেন। পরে মিঃ ব্যানার্জ্জী তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ডাক-বাংলোয় লইয়া গেলেন। সেখানে এক জন জমীদারের কর্ম্মচারী ৫।৬ জন লোকের দ্বারা আনীত বহুবিধ ফল, শাকসব্জী, কেক্-বিস্কুট, পাঁউরুটী, সোডা-ব্রাণ্ডী, মুর্গী, আণ্ডা, প্রভৃতি জিনিষ লইয়া উপস্থিত ছিল। সাহেব সেগুলি দেখিয়া উৎফুল্লনেত্রে একবার সেই আমলার দিকে ও একবার মিঃ ব্যানার্জ্জীর দিকে তাকাইলেন। ইহাতে তাঁহারা নিজদিগকে কৃতার্থবোধ করিলেন। সাহেব সেই জমীদারের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহাকে মোলাকাত করিবার জন্য অনুমতি দিলেন। বলা বাহুল্য, মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ ব্যানার্জ্জীর কুঠীতেও আর একটা ডালি দেওয়া হইয়াছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ৩ দিন সেখানে থাকিয়া আফিসের কায-কর্ম্ম দেখিয়া খুব সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। মিঃ ব্যানার্জ্জী সদরে থাকিতে তাঁহার মন বুঝিয়া কার্য্য করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। সাহেব মিঃ ব্যানার্জ্জীকে বলিলেন,—

"I am glad to see that the cross examination of the witnesses examined by you is very brief. How do you

manage to shut up the Muktears?" (আমি দেখিতেছি, সাক্ষীদের জেরা খুব সংক্ষিপ্ত; আপনি মোক্তারদের মুখ বন্ধ করেন কিরূপে ?)

মিঃ ব্যানার্জ্জী বলিলেন—"Sir, I know that the Muktears try to drag on cases mainly in their own interest. When they find that I don't take down replies to unnecessary and irrelevent questions, they sit down of their own accord." (আমি জানি, মোক্তাররা তাহাদের আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্যই প্রধানতঃ মোকদ্দমা বাড়ায়। জেরা করিবার সময় যখন তাহারা দেখে যে, আমি অনর্থক প্রশ্নের জবাব লিখিতেছি না, তখন তাহারা অমনি বসিয়া পড়ে।)

সাহেব বলিলেন—"Quite right. How do you manage to show almost 99 p. c. conviction in Police cases?" (ঠিক কথা। পুলিসের মোকদ্দমায় আপনি শতকরা ৯৯টিতে সাজা দেন কিরূপে ?)

মিঃ ব্যানার্জ্জী বলিলেন—"Sir, when the Thana-officer has once shifted the evidence on the spot and sent up the accused for trial, I generally do not find any reason to differ from him." (থানার দারোগারা যখন সরেজমিনে সাক্ষীদিগের জবানবন্দী তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া আসামী চালান দেয়, তখন সাধারণতঃ আমি তাহাদের মত অগ্রাহ্য করিবার কোন কারণ দেখি না।)

এই কথা শুনিয়া সাহেব একটু হাসিলেন।

এইরূপে পরিদর্শন শেষ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব যাইবার পূর্ব্বে ডাক-বাংলোয় বসিয়া মিঃ ব্যানার্জ্জীর হাতে একখানা কাগজ দিয়া পড়িতে

বলিলেন। ইহা একখানি বেনামী চিঠি, ইহাতে এইরূপ লেখা ছিল :—

"The new S. D. O. eats *ghorse.* He took a *substitude* in his camp and his wife came and driven her out with a *Jhata.* Please enquire." (নূতন হাকিম ঘুষ খান। তিনি ক্যাম্পে একজন বেশ্যা আনিয়াছিলেন, তাঁহার স্ত্রী আসিয়া তাহাকে ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইয়াছিল। আপনি তদন্ত করুন)। যেরূপ অশুদ্ধ ইংরাজীতে ইহা লেখা, অনুবাদে তাহার রস বুঝা যাইবে না।

ইহা পড়িয়া মিঃ ব্যানার্জ্জীর মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল। সাহেব তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—

"You must know that I hate all such anonymous letters. They are written by cowards who have not the courage to come out in public with their griev ances. So I throw them into the waste paper basket." (তুমি জানিয়া রাখিবে, আমি এই সকল বেনামী চিঠি অত্যন্ত ঘৃণা করি। যে সকল কাপুরুষ তাহাদের নালিশ প্রকাশ্যে জানাইতে সাহস করে না, তাহারাই এ সব চিঠি লেখে। আমি এ সব চিঠি ফেলিয়া দিই।)

এই বলিয়া সাহেব সেই চিঠিখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। অবশেষে তিনি হাসিয়া বলিলেন—

"I know young men sometimes show signs of exuberance of youth. We don't take notice of them unless they create scandals." (আমি জানি, যুবকগণ বয়সের ধর্ম্ম অনুসারে স্ফুর্ত্তি করে। যতক্ষণ তাহাতে কেলেঙ্কারী না হয়, ততক্ষণ আমরা তাহা গ্রাহ্য করি না।)

এই বলিয়া সাহেব মিঃ ব্যানার্জ্জীর করমর্দ্দন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। মিঃ ব্যানার্জ্জী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

চার

সত্যকিঙ্কর বাবু এক দিন ৫টার পরে কোর্ট হইতে আসিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া বেড়াইতে বাহির হইতেছেন, এই সময়ে কোর্ট সব-ইন্‌স্পেক্টার এক জন ডাকাতি মোকদ্দমার আসামীকে দুইখানা সোনার গহনা সহ আনিয়া হাজির করিয়া বলিলেন,—

"হুজুর, এই আসামী confession (অপরাধ স্বীকার) করিয়া এই মাল বাহির করিয়া দিয়াছে. confession (স্বীকারোক্তি) রেকর্ড করিতে হইবে। ভবেশ বাবু কি অন্য কোন ডেপুটীর উপর ভার দিন।"

সত্যকিঙ্কর বাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন,—"তাঁরাও ত সব খেটে খুটে এসেছেন, এখন হয় ত খেলার মাঠে গিয়েছেন। আচ্ছা, আমি নিজেই confession রেকর্ড করছি।"

এই বলিয়া তিনি বৈঠকখানায় ঢুকিলেন এবং টেবলের সম্মুখে দোয়াত-কলম লইয়া বসিলেন। কোর্ট-বাবু কাগজ-পত্র সম্মুখে রাখিয়া বাহির হইয়া গেলেন। আসামীর স্বীকারোক্তি লিখিবার সময় কোন পুলিস থাকিতে পারে না। দুই জন কনষ্টেবল আসামীকে আনিয়া হাকিমের নিকট রাখিয়া বাহিরে গিয়া দূরে দাঁড়াইল। একগাছা সোনার বালা ও এক ছড়া হার কোর্ট-বাবু পূর্ব্বেই টেবলের উপর রাখিয়া ছিলেন।

সত্যকিঙ্কর বাবু যথারীতি আসামীকে এইরূপ ওয়ার্নীং দিলেন,— "তুমি ভাল করিয়া দেখ, এখানে কোন পুলিশ নাই, তুমি কাহারও ভয়ে

কোন কথা বলিও না, তোমাকে কেহ কোন কথা শিখাইয়া দিয়া থাকিলে তাহা বলিও না, তুমি তোমার আপন খুসীতে যাহা ইচ্ছা আমার নিকট বলিতে পার। আমি এক জন হাকিম, আমার নিকট তুমি কোন অপরাধ স্বীকার করিলে, তাহাতে তোমার সাজা হইতে পারে। এই সব কথা ভালরূপ বিবেচনা করিয়া তুমি যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমার নিকট কোন কথা বলিতে পার। তুমি কিছু বলিতে চাও?"

আসামী বলিল—"আজ্ঞে হুজুর, আমি যাহা করেছি, সব বলব। আপনি লিখুন।"

এই কথার পরে সত্যকিঙ্কর বাবু ছাপা ফরম লইয়া লিখিতে বসিলেন। তিনি আসামীর নাম-ধাম ইত্যাদি লিখিয়া পরে তাহার উক্তি লিখিলেন। আসামী বলিল, সে আর ৬ জন লোক (তাহাদের নাম বলিল) ইহারা মিলিয়া লতিফপুর গ্রামের বংশীধর সাহার বাড়ীতে ডাকাতি করিতে গিয়াছিল। তাহারা ঘরে ঢুকিয়া লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া অনেক নগদ টাকা ও সোনার গহনা আনিয়াছিল। তাহার ভাগে তিন শ টাকা ও এই দুইখানা সোনার গহনা পড়িয়াছিল, সে এই গহনা মাটীর তলে পুতিয়া রাখিয়াছিল, পুলিসের নিকট বাহির করিয়া দিয়াছে। সত্যকিঙ্কর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, তুমি দারোগা যাওয়া মাত্রই আপন খুসিতে অপরাধ স্বীকার করিয়া এইগুলি বাহির করিয়া দিয়াছিলে?"

এই প্রশ্ন শুনিয়া আসামী সচকিতে চারিদিক তাকাইয়া এবং একবার দরজার কাছে গিয়া বাহিরের দিকে ভাল করিয়া দেখিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল,—

"হুজুর, আপন ইচ্ছায় কি দিয়াছিলাম? দুই জন কনষ্টেবল আমার মাথায় একখান পাথর চাপাইয়া রৌদ্রে অনেকক্ষণ বসাইয়া রাখিয়াছিল,

দারোগা আমার বাড়ীর মেয়েলোকদিগকে বে-ইজ্জত করিবার ভয় দেখাইয়াছিলেন। তখন আমি ভয়ে এই সকল কথা স্বীকার করিয়া মাল বাহির করিয়া দিয়াছিলাম। সেই অত্যাচারের কথা মনে হইলে এখনও আমার ভয় হয়।"

আসামীর এই জবাব শুনিয়া সত্যকিঙ্কর বাবু অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। অবশেষে তিনি রেকর্ড শেষ করিয়া তাহার নীচে এইরূপ সার্টিফিকেট (certificate) দিলেন—"The confession does not appear to be voluntary." (আসামী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অপরাধ স্বীকার করে নাই।)

কোর্টবাবু আসিয়া আসামীকে লইয়া গেলেন। সে দিন এই পর্য্যন্ত। পরদিন সত্যকিঙ্কর বাবু কোর্টে যাওয়ামাত্র ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

তিনি যাইয়া সাহেবকে সেলাম দিলে—সাহেব "Good morning, Satya Babu" বলিয়া তাঁহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। পরে অতি রুক্ষস্বরে বলিলেন,—"Satya Babu, I am surprised to see that being a senior officer you have managed to spoil this dacoity case of which you recorded the confession of an accused yesterday." (সত্য বাবু, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, আপনি এক জন সিনিয়ার অফিসার, অথচ আপনি কাল সেই ডাকাতি মোকদ্দমাটার আসামীর স্বীকারোক্তি লিখিতে গিয়া মোকদ্দমাটাকে মাটী করিয়া দিয়াছেন।)

সত্য বাবু বিমর্ষ হইয়া বলিলেন—"How have I spoilt this case, Sir? I merely recorded what the accused stated before me." (আমি কিরূপে মোকদ্দমা নষ্ট করিলাম?

আসামী আমার কাছে যাহা বলিয়াছে, আমি ত কেবল তাহাই লিখিয়াছি।)

পরে উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হইল, নিম্নে তাহার অনুবাদ দিতেছি।

ম্যাজি। সেই স্বীকারোক্তির কাগজ এই দেখুন। আসামীকে আপনার শেষ প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করিবার কোন্ প্রয়োজন ছিল ? এই শেষ প্রশ্নের উত্তরে আসামী যাহা বলিল, তাহাতে প্রথমকার অপরাধ স্বীকারটা সব নষ্ট হইয়া গেল।

সত্য। কিন্তু আসামীর দোষ-স্বীকার স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কিনা, আমাকে ত তাহা ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া তবে সার্টিফিকেট দিতে হইবে ? নচেৎ আমি সে সার্টিফিকেট কি প্রকারে দিতে পারি ?

ম্যাজি। সত্য বাবু, আপনার ত যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে, আপনি অনেক স্বীকারোক্তি লিখিয়াছেন, আপনি বলিতে পারেন, কোনো আসামী সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কখনও অপরাধ স্বীকার করিয়াছে কি ?

সত্য। হাঁ, করিয়াছে বৈ কি ? যেখানে আমার সে বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে, আমি সেখানে ঐ সার্টিফিকেট দিই নাই।

ম্যাজি। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আসামী নিজে চোরা-মাল বাহির করিয়া দিয়াছিল। ইহাতে সন্দেহের অবসর কোথায় ?

সত্য। আসামী যে চুরি করিয়াছিল, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ না হইতে পারে, কিন্তু তাহার স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কি না, তাহাই বিবেচনার বিষয়। মাল বাহির করিয়া দেওয়াতেও সময় সময় সন্দেহের কারণ হয়।

ম্যাজি। সে কেমন ?

সত্য। আমি জানি, কোন কোন পুলিশ-দারোগা নাম করবার জন্য চোরাই মালের ফর্দ্দ দেখিয়া ঠিক সেই রকম নূতন গহনা সেকরা দিয়া তৈয়ার করাইয়া আসামীর সঙ্গে চালান দেয়।

ম্যাজি।—This is simply preposterous (এটা নিতান্ত আজগুবি কথা), You must know, the Magistrates are not udicial officers like Munsiff's. They are Magistrates who help the criminal administration of the district. They are expected to make up small lapses and short comings of the Police. (আপনি জানিয়া রাখুন, ম্যাজিষ্ট্রেটরা মুনসেফদিগের ন্যায় কেবল বিচারক নহেন। তাঁহারা জেলার শাসন বিষয়ে সাহায্য করিবেন এবং পুলিশের সামান্য ত্রুটি তাঁহারা ঢাকিয়া লইবেন।)

সত্য।—But, sir, it must be your personal opinion, It can't be the policy of the benign British Government which is expected to administer even-handed justice in this country. (এটা আপনার নিজের মত হইতে পারে। কিন্তু যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এ দেশে ন্যায়বিচার করিতে আসিয়াছেন, ইহা সেই গবর্ণমেণ্টের পলিসি কিছুতেই হইতে পারে না।)

এই কথা শুনিয়া সাহেব রাগিয়া বলিলেন—"I don't wish to argue with you Satya Babu, I see you are unfit to do criminal work. Good morning." (আমি আপনার সঙ্গে বাদানুবাদ করিতে ইচ্ছা করি না—আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনি ফৌজদারী কাযের অনুপযুক্ত। গুডমর্ণিং অর্থাৎ এখন উঠুন।)

সত্য বাবু সাহেবকে সেলাম দিয়া চলিয়া আসিলেন। "কর্ম্মণ্যে-বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন—" এই বাক্য বারংবার তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল।

তাহার পরদিন সাহেব হুকুম দিলেন, সত্যকিঙ্কর বাবু ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার না করিয়া এখন হইতে ট্রেজারির কার্য্য করিবেন। ইহার তিন মাস পরে অফিসারদের চরিত্র সম্বন্ধে কালেক্টার যে গোপনীয় রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টে পাঠান, তাহাতে সাহেব সত্য বাবুর সম্বন্ধে লিখিলেন—"He is lacking in enthusiasm in the performance of his duty, has got a too refined sense of criminal justice ; altogether not a success."

(ইঁহার কাযে উৎসাহ নাই, ফৌজদারী মোকদ্দমায় অতি সূক্ষ্ম বিচার করিতে ইচ্ছা করেন, মোটের উপর সফলতা দেখাইতে পারেন নাই) আর মিঃ টি, টি, ব্যানার্জ্জী সম্বন্ধে সাহেব লিখিলেন—"An excellent officer, very keen, quick and energetic" (—এক জন উৎকৃষ্ট অফিসার, খুব বুদ্ধিমান্, উৎসাহী ও কর্ম্মঠ)। এই রিপোর্ট যাওয়ার এক মাস পরে সত্যকিঙ্কর বাবু আমিনগঞ্জ মহকুমার সেকেণ্ড অফিসার হইয়া বদলী হইলেন। মিঃ ব্যানার্জ্জী পুরা ৩ বৎসর করিমগঞ্জে কাটাইয়া দাসেরহাট মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হইলেন।

পাঁচ

দাসেরহাট মহকুমায় যাওয়ার পরে মিঃ ব্যানার্জ্জীর নানা প্রকার কীর্ত্তি বাহির হইতে লাগিল।

বসন্তপুর গ্রামে তিনি পশুপতি বাবু জমীদারের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত

হইয়া গিয়াছেন, পশুপতি বাবু তাঁহকে বৈঠকখানায় বসাইয়া চা খাওয়াইতেছেন। তিনি তাঁহার একটি ১২ বৎসর বয়সের মেয়েকে ডাকিয়া চা তৈয়ার করিয়া দিতে বলিলেন। মেয়েটির নাম রমলা দেখিতে খুব সুন্দরী। তাহার গায় নানাপ্রকার গহনা ঝলমল করিতেছিল। মিঃ ব্যানার্জ্জী তাহাকে আদর করিয়া নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদায় লওয়ার সময় তিনি পশুপতি বাবুকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন,—

"মশায়, আপনি ত আমাকে খুব চা খাওয়াইলেন। এখন আমার বাড়ীতে কবে একবার যাবেন, তাই বলুন।"

পশুপতি বাবু বলিলেন, "আপনি আমাদের হাকিম, রাজপ্রতিনিধি, আপনি আমার কুটীরে পদার্পণ ক'রে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। যে দিন হুকুম করেন, সেই দিনই আপনার কুঠীতে গিয়ে দেখা ক'রব।"

এবার গলার স্বর নীচু করিয়া মিঃ ব্যানার্জ্জী বলিলেন—"মশায়, সম্প্রতি এক বিপদে পড়েছি। আমার একটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে, সে আপনার এই রমলার সমান হবে—বরং কিছু বড়। তার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে, শীঘ্রই তাকে বরের পিতা দেখতে আসবেন। আমরা চাকুরে মানুষ, রোজ আনি, রোজ খাই, তার গহনা-পত্র সেরূপ কিছু নাই, যা পরাইয়া তাকে ভদ্রলোকের সামনে বাহির করতে পারি। আপনি যদি মেয়ে-দেখানোর দিন আপনার মেয়ের কয়েকখানা গহনা পরাইয়া তাকে বাহির করতে দেন, তবে বড়ই অনুগৃহীত হইব। আমি পরের দিনই আবার সে গহনা ফেরত পাঠাব।"

পশুপতি বাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"সে আর কি কথা, মশায়! আপনি যে দিন অনুমতি করবেন, সেই দিনই একটি বাক্সে ক'রে রমলার সব গহনা আপনার কুঠীতে পাঠাইয়া দিব। আপনি যে আমাকে

আত্মীয় মনে ক'রে এরূপ অনুরোধ করলেন, এতে আমি কৃতার্থ হলেম। আপনার মেয়ে কি আমার মেয়ে নয়? আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।"

মিঃ ব্যানার্জ্জী খুব জোরের সহিত তাঁহার করমর্দ্দন করিয়া মোটর গাড়ীতে উঠিলেন। তিনি এই নূতন মহকুমায় আসিবার সময় ধারে একখানা মোটর গাড়ী কিনিয়া আনিয়াছেন।

যথা সময়ে সংবাদ পাইয়া পশুপতি বাবু এক জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর হস্তে তাঁহার মেয়ের গহনার বাক্স মিঃ ব্যানার্জ্জীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মিঃ ব্যানার্জ্জী সেই কর্ম্মচারীর নিকট যথেষ্ট মৌখিক ধন্যবাদ জানাইলেন, কিন্তু কোন চিঠি দিলেন না। তাঁহার মেয়ে দেখান হইয়া গেল। তাহার পরেও এক মাস অতীত হইল, কিন্তু তিনি গহনাগুলি ফেরত দেওয়ার নামও করিলেন না। পশুপতি বাবু এ বিষয়ে তাগাদা করিতে নিতান্ত লজ্জাবোধ করিলেন। আর এক মাস পরে তিনি একখানা চিঠি লিখিলেন, কিন্তু তাহার কোন উত্তর পাইলেন না। অবশেষে গৃহিণীর তাড়নায় নিতান্ত অতিষ্ঠ হইয়া তিনি এক দিন মিঃ ব্যানার্জ্জীর বাংলোতে উপস্থিত হইলেন। মিঃ ব্যানার্জ্জী তাঁহাকে যথেষ্ট আপ্যায়িত করিয়া চা খাওয়াইলেন, পরে বলিলেন,—

"পশুপতি বাবু, আপনার নিকট আমার লজ্জায় মুখ-দেখান কষ্টকর হয়েছে। আমি আপনার চিঠি পেয়েছি, কিন্তু সব কথা চিঠিতে ত লেখা যায় না, সে জন্য উত্তর দি নাই। আমার মেয়েটা নিতান্ত নির্ব্বোধ। তার আপন-পর জ্ঞান নাই। আপনার মেয়ের গহনাগুলি তার গায় চমৎকার মানিয়েছিল, সে জন্য সে আর কিছুতেই সেগুলি খুলতে চায় না। আমার স্ত্রী তাকে অনেক রকমে বুঝাইতে সে গহনাগুলি খুলে দিয়েছে, কেবল একছড়া নেকলেস্ কিছুতেই খুলছে

না। এখন আমি তাকে ঐ রকম আর একছড়া নেকলেস্ না দিলে তার গলা থেকে সেটা কিছুতেই নেওয়া যাবে না। আমি সে জন্য কোন গহনাই আপনাকে পাঠাতে পারছি না, অথচ লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।"

এই কথা শুনিয়া পশুপতি বাবু হাসিয়া বলিলেন—"সে জন্য ভাবনা কি, মিঃ ব্যানার্জ্জী? আপনি কি মনে করেন, আমি আপনার মেয়েকে সেই নেকলেস্‌টা উপহার দিতে পারি না?"

মিঃ ব্যানার্জ্জী বলিলেন—"তা কি ক'রে হয়—তা' কি ক'রে হয়—সে জিনিষটার দাম ত কম নয়, চার পাঁচ শ টাকা হবে। আপনি এত টাকা দামের জিনিষ দেবেন কেন?"

পশুপতি বাবু বলিলেন,—"তা'তে কি? আমি খুব সন্তুষ্টচিত্তে আপনার মেয়েকে সেই নেকলেস্‌টা উপহার দিচ্ছি। তার বিয়ের সময় আপনি আমাকে অবশ্য নিমন্ত্রণ করবেন, সে সময় আমার কিছু দিতে হবে, সেটা আমি আগেই দিচ্ছি।"

এই কথার পরে মিঃ ব্যানার্জ্জী তাঁহার স্ত্রীর নিকট হইতে সেই গহনার বাক্স আনিয়া দিলেন। পশুপতি বাবু তাহা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু মানুষের সব দিন সমান যায় না। মিঃ ব্যানার্জ্জীর ভাগ্যগগনে যেন কিঞ্চিৎ মেঘের সঞ্চার হইল।

ছয়

Dear Tarun Tapan Babu,

I find that in the case Emp. *vrs.* Arshad Ali under S. 110 Cr. P. C. your judgment betrays complete

ignorance of law and procedure. The Sessions Judge says that the deposition of witnesses recorded by you is too meagre and he has reasons to suspect that you omit to record statements which go in favour of the accused. I hope you will be good enough to mend your ways and study High Court Rulings carefully.

Yours faithfully,

R. Soberly.

এক দিন তাঁহার নূতন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে এই ডেমি অফিসিয়াল চিঠি পাইয়া তরুণতপনের চক্ষুঃস্থির হইল। তাঁহার এত সাধের "মিষ্টার" কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। সাহেব লিখিয়াছেন, তিনি আইন জানেন না। জজ সাহেব বলিয়াছেন, তিনি সাক্ষীর জবানবন্দীতে অনেক কথা লেখেন না, বিশেষতঃ যে সব কথা আসামীর অনুকূলে যাইতে পারে। এ যে বড় সাংঘাতিক কথা। তাঁহার উদীয়মান সৌভাগ্য-রবি কি তবে আকাশের মধ্যপথে উঠিবার পূর্ব্বেই অস্ত যাইবে? এ সাহেবকে কিরূপে বশ করিতে পারা যায়, তিনি তাহা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

তিনি সংবাদ পাইলেন, তাঁহার এলাকার মধ্যে লক্ষ্মণপুর থানায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব টুরে আসিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সাহেব তাঁহাকে কোন সংবাদ পাঠান নাই। তিনি একটা ডালি সাজাইয়া লইয়া সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে যাইলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সোবারলি (Soberly) একটা ডাক-বাংলোর অবস্থিতি করিতেছিলেন। মিঃ ব্যানার্জ্জী তাঁহার মোটর গাড়ীতে সেখানে আসিলেন। সাহেব গাড়ীর শব্দ শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে তাকাইলেন, পরে মিঃ ব্যানার্জ্জী আসিয়া কার্ড দিলে

তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলে সাহেব হাসিমুখে তাঁহাকে যথেষ্ট ভদ্রতার সহিত গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—

"Tarun Tapan Babu, I see in your card you prefer to call yourself 'Mr.' But I don't mean any offence when I address you as 'Babu'. I consider it as respectable as 'Mr'." (আপনার কার্ডে আপনি নিজের নামের পূর্ব্বে মিষ্টার লিখিতে ভালবাসেন দেখিতেছি, কিন্তু আমি আপনাকে বাবু বলিতেছি বলিয়া মনে করিবেন না, আপনাকে অপমান করিবার জন্য এরূপ সম্বোধন করিতেছি। আমি 'বাবু'কে মিষ্টারের চেয়ে কম সম্মান-জনক মনে করি না।)

এই সময়ে মিঃ ব্যানার্জ্জী-প্রদত্ত ফলের ডালির প্রতি সাহেবের নজর পড়িল। সাহেব বলিলেন,—

"What are all these things? Oh, you wish to present them to me? I am sorry Tarun Tapan Babu, I can't accept them. Have you forgotten the Government circular on the subject, or knowing it you prefer not to obey it?" (এ সব কি? আপনি বুঝি এগুলি আমাকে দিতে চান? কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি এ সব নিতে পারি না। আপনি কি এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সারকুলার ভুলিয়াছেন, অথবা তাহা জানিয়াও সে অনুসারে কায করিতে পছন্দ করেন না?)

এই কথা শুনিয়া তরুণতপনের মুখ সাদা হইয়া গেল। তিনি কি বলিবেন, খুঁজিয়া পাইলেন না। সাহেব তাঁহার এই ভাব দেখিয়া বলিলেন,—

"However, I don't mean to wound your feelings. I accept one fruit, a plantain. চাপরাশী—একঠো কেলা লেও।" (যা হউক, আমি আপনার মনে কষ্ট দিতে চাই না, আমি একটা কলা নিতেছি।)

চাপরাশী একটা কলা আনিয়া দিল। সাহেব তাহা টেবলের উপর রাখিয়া বলিলেন,—

"Have you anything particular to say to me?" (আপনার আমাকে কি কোন কথা বলিবার আছে?)

তরুণতপন বলিলেন,—"No sir, I have only come to pay my respects to you." (না—আমি আপনাকে কেবল সেলাম দিতে আসিয়াছি।)

সাহেব বলিলেন,—"Very well, Tarun Tapan Babu, I don't wish to detain you. I don't like people coming to dance attendance on me neglecting their own business. Please take away your things. Your necessity is greater than mine as I enjoy a higher salary. I hope you are not living beyond your means. Good bye." (বেশ, আপনি এখন যেতে পারেন। লোকে তাদের নিজের কায-কর্ম্ম ফেলিয়া আমার পিছনে ছুটিবে, আমি তাহা আদৌ পছন্দ করি না। আপনার এ সব জিনিষ নিয়া যান। আমার চেয়ে আপনার অভাব বেশী; কারণ, আমি আপনার চেয়ে বেশী মাহিনা পাই। আপনি ত আপনার আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করেন না? তবে এখন আসুন।)

মিঃ ব্যানার্জ্জী বুঝিলেন, সাহেবের শেষের মন্তব্যটি তাঁহার মোটর গাড়ীর জন্য। তিনি আজ কি কুক্ষণে যাত্রা করিয়াছিলেন। এ যে বড়

কঠিন ঠাঁই, এখানে তাঁহার কোন ছলাকলা খাটিবে না। তিনি এখন হইতে অনেক ফৌজদারী মোকদ্দমায় অনেক আসামী খালাস দিতে আরম্ভ করিলেন। তবে লোকে বলে, সে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে নহে।

যাহা হউক মিঃ ব্যানার্জ্জীর ভাগ্য ভাল। সোবারলী সাহেব বেশী দিন এ জেলায় থাকিলেন না, তিনি কমিশনার হইয়া অন্যত্র বদলী হইলেন। তাঁহার স্থানে যিনি আসিলেন, তিনি আবার সম্পূর্ণ অন্য ধরণের লোক। তাঁহার নাম মিঃ পম্পাই (Mr. Pompy), তিনি মোকদ্দমার সাজাখালাস লইয়া মাথাঘামানো পছন্দ করিতেন না। তিনি এক জন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী (Imperialist), তিনি খুব ধুমধাম জাঁকজমক ভালবাসেন, যাহাতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে লোকে খুব ভয় করে, যাহাতে তাঁহার নিজের কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হয়—এই সব বিষয় লইয়া তিনি মহা ব্যস্ত। তিনি জানেন, চৌকীদার ও দফাদারগণই মফঃস্বলে গবর্ণমেণ্টের প্রতীক, যদি লোকে তাহাদিগকে ভয় করে ও মান্য করে, তবেই বৃটিশ জাতির প্রতাপ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এ জন্য চৌকিদারদের বেতন-বিলির সময় থানায় তিনি নিজে উপস্থিত থাকিতেন। চৌকিদারদের পোষাক খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইবে, তাহাদের হাতের লাঠি কতখানি লম্বা হইবে ও কতটা মোটা হইবে, দফাদারদের মাথার পাগড়ী খুব টুক্‌টুকে লাল হইবে, তাহারা সমানভাবে পা ফেলিয়া ড্রিল করিবে—তিনি নিজে এই সকল বিষয়ে উপদেশ দেন। দফাদারদের লোকের দৃষ্টিতে সম্মানবৃদ্ধির জন্য তিনি তাহাদিগকে "ডফাডার মহাশয়, আপনি" বলিয়া সম্বোধন করেন। তিনি যখন ঘোড়ায় চড়িয়া মফঃস্বলে ভ্রমণ করেন, তখন রাস্তার মোড়ে মোড়ে চৌকিদারগণকে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সেলাম করিতে হয়। ডিষ্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ার, ওভারসিয়ার, স্কুলের ডেপুটী ইনস্‌পেক্‌টার, হেলথ-অফিসার, ভ্যাক্সিনেসন ইনস্‌পেক্‌টার, পুলিস ইনস্‌পেক্টার, দারোগা,

জমাদার ইত্যাদি অনেক কর্ম্মচারীকে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে হয়।

মিঃ ব্যানার্জ্জী খুব অল্পদিনের মধ্যে পম্পাই সাহেবের মেজাজ চিনিয়া লইলেন ও তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। দাসের-হাট মহকুমার স্কুলের বোর্ডিং ছিল না, মিঃ ব্যানার্জ্জী পম্পাই সাহেবের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তাঁহার অনুমতি লইয়া একটা বোর্ডিং-ঘর নির্ম্মাণের জন্য চাঁদা সংগ্রহ আরম্ভ করিলেন। ছয় মাসের মধ্যে দশ হাজার টাকা সংগৃহীত হইল এবং এক বৎসরের মধ্যে বোর্ডিং নির্ম্মিত হইল। তাহার দ্বার উদ্‌ঘাটন (opening ceremony) করিবার জন্য তিনি কালেক্‌টার পম্পাই সাহেবকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তখন তিনি খুব ধুমধাম করিলেন। টাউনের রাস্তার দুই পার্শ্ব কলাগাছ ও রঙ্গীন কাগজের মালায় সুশোভিত হইল। স্থানে স্থানে পত্র-পুষ্প-পতাকা-শোভিত কয়েকটি গেট নির্ম্মিত হইল। সাহেব আসিবার সময় রাস্তার দুই ধারে চৌকীদারগণ তাহাদের চক্‌চকে তমকা আঁটিয়া ও ফিট্‌ফাট পোষাক পরিয়া দাঁড়াইয়া লম্বা লাঠি হাতে তাঁহাকে অভিবাদন করিল। এই সকল দেখিয়া সাহেব মহাখুসী হইয়া "Pompy Boarding" (পম্পাই বোর্ডিং) এর দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন, এবং সেই সভায় মিঃ ব্যানার্জ্জীর অনেক প্রশংসা করিয়া এক বক্তৃতা দিলেন। পরে মিঃ ব্যানার্জ্জী ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে খুব পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন, এবং নিজেও সে সঙ্গে খাইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সদরে ফিরিয়া গিয়া যথাসময়ে মিঃ ব্যানার্জ্জীকে 'রায় সাহেব' খেতাব দেওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিলেন। আবার এ দিকে বোর্ডিংএর সমস্ত খরচপত্র বাদে যে দুই হাজার টাকা বাঁচিল; সে টাকাটা মিঃ ব্যানার্জ্জী গ্রহণ করিয়া তাঁহার মোটর গাড়ীর খরচ পোষাইয়া লইলেন। এইরূপে মেঘ কাটিয়া গেলে

তরুণতপন মধ্যাহ্ন-ভাস্করের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন। ইহার পরে যখন প্রমোশনের সময় আসিল, তখন তরুণতপন চারি শত টাকার গ্রেডে প্রমোশন পাইলেন, আর সত্যকিঙ্কর বাবুকে ডিঙ্গাইয়া তাঁহার নীচেকার এক জন অফিসার পাঁচ শত টাকার গ্রেডে প্রমোশন পাইলেন। সে বেচারীর প্রমোশন বন্ধ হইল।

সাত

আমিনগঞ্জ মহকুমায় যাইয়া সত্যকিঙ্কর বাবু মিঃ টমাস্ (Thomas) নামক এক জন জুনিয়ার সিভিলিয়ানের অধীনে কাজ করিতে লাগিলেন। টমাস সাহেব নেহাৎ ছোকরা হইলেও খুব বুদ্ধিমান্ এবং কার্য্যদক্ষ। সত্য বাবু ইঁহার অধীনে ৬ মাস কাজ করিলে, সাহেব তাঁহাকে এক জন বিচক্ষণ, ন্যায়পরায়ণ ও ধর্ম্মভীরু লোক বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং অনেক জটিল বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে এই সাহেব Appointment Department এর Under Secretary নিযুক্ত হইয়া বদলী হইলেন। যাইবার সময় সাহেব বলিলেন—"সত্য বাবু, আপনার প্রতি ঘোর অবিচার হইয়াছে, আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। আপনি প্রমোশনের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট একটা representation (আবেদন) পাঠান; আর চীফ সেক্রেটারীর সঙ্গে একবার দেখা করিবেন।" সাহেব চলিয়া যাওয়ার সময়ে সত্য বাবু একটা representation (আবেদন) দিলেন এবং সাহেব তাহাতে সত্য বাবুর অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া অবশেষে লিখিলেন, আমি ইঁহার নিকট অনেককায শিখিয়াছি। সাহেব যাইয়া কিছু দিন পরে সত্য বাবুকে প্রতাপপুর জেলার সদরে বদলী করিলেন। ইহার পরে সেই

জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট তিন মাসের ছুটী লইলেন, এবং সেই জেলার অন্তর্গত দাসেরহাট মহকুমা হইতে মিঃ টি, টি, ব্যানার্জ্জী সদরে একটিং-ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টার হইয়া আসিলেন। সত্যকিঙ্কর বাবু তাঁহার সিনিয়ার ছিলেন, কিন্তু তখন তাঁহার প্রমোশন বন্ধ, সে জন্য তিনি একটিং কাজ পাইলেন না। ইহার অল্পদিন পরেই তরুণতপন "রায় সাহেব" উপাধি লাভ করিয়া তাঁহার বড় সাধের "মিঃ" খেতাবকে বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইলেন। সত্য বাবু এইরূপ উপর্য্যুপরি বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া চাকুরীর প্রতি নিতান্ত বীতস্পৃহ হইয়া পড়িলেন। এই সময় টমাস সাহেব তাঁহাকে চিঠি লিখিয়া জানাইলেন যে, তাঁহার শীঘ্র আসিয়া Chief Secretaryর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা উচিত।

Chief Secretary Mr. Whit (হুইট্) এক জন ন্যায়বান্ ও ধীরপ্রকৃতির লোক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া ছিলেন। সত্য বাবু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া বলিলেন,—

"Sir, my promotion to the Rs. 500 grade has been stopped. May I enquire for what fault of mine, I have been superseded ?" (আমার প্রমোশন কেন বন্ধ হইয়াছে, আমি জানিতে পারি কি ?)

চীফ সেক্রেটারী বলিলেন—Satya Babu, promotion to the senior grades is not given according to seniority alone but according to merit. (উপরের গ্রেডের প্রমোশন গুণানুসারে দেওয়া হয়, কেবল সিনিয়ার হইলে হয় না।)

সত্য।—But sir, how do you judge our merits ? (আমাদের গুণ কিরূপে আপনারা বিচার করেন ?)

চিফ।—From the confidential character reports of

your Superior Officers. (আপনাদের উপরিস্থ কর্ম্মচারীদিগের গোপনীয় রিপোর্ট অনুসারে।)

সত্য।—But sir, I hope you will kindly excuse me when I say that a more unreliable machinery for judging our merits could not have been set up by Govt. Under the present system rogues, thieves and cheats are prospering and honest officers have no chance. (আমাদের গুণের বিচার করিবার পক্ষে এরূপ অবিশ্বাসজনক-যন্ত্র আর হইতে পারে না—এই যন্ত্রের অধীনে থাকিয়া যত বাঁদর, ছুঁচো, চোর, দিব্য উন্নতিলাভ করিতেছে, কিন্তু খাঁটি লোকের কোন আশা নাই।)

এই কথা শুনিয়া হুইট্ সাহেবের মুখ লাল হইয়া গেল, তিনি বলিলেন—" Satya Babu, please don't be excited, I know the collectors are not infallible." (আমি জানি, কালেক্টাররা ভুল করিতে পারেন।)

সত্য।—But they are guided by their own whims and caprices. They fall easy prey into the hands of self-seeking designing men; some times they are incapable of judging the merits of officers on account of their own incompetence and in-experience. For these reasons it is quite unsafe to place absolute reliance on their reports which are submitted behind our backs." (কালেক্টাররা আপন আপন খেয়াল অনুসারে চলেন, তাঁহারা সহজেই স্বার্থান্বেষী চতুর লোকের ফাঁদে পড়েন, কখন কখন তাঁহাদের অনভিজ্ঞতা ও অক্ষমতার জন্য অনেক অফিসারের দোষ-গুণ বুঝিতে পারেন না, সে

জন্য তাঁহারা আমাদের সম্বন্ধে যে সকল এক-তরফা রিপোর্ট পাঠান, তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরকরা উচিত নহে।)

চীফ সেক্রেটারী সত্য বাবুর কথাগুলি শুনিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। তিনি নিতান্ত ধীরপ্রকৃতি ও বিচক্ষণ লোক, সহসা ক্রোধ প্রকাশ করেন না। তিনি সত্য বাবুর যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারিয়া অবশেষে বলিলেন, –

"I have seen your representaion, Satya Babu. Thomas speaks highly of you. I will consider your case. Good bye." (আমি আপনার দরখাস্ত পড়িয়া দেখিয়াছি, ও টমাস আপনার খুব প্রশংসা করিয়াছেন, আমি আপনার সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিব। আচ্ছা, এখন আসুন।)

সত্য বাবু টমাস সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া আসিলেন। ইহার তিন মাস পরে তাঁহার প্রমোশন হইল, কিন্তু মিঃ টি, টি, ব্যানার্জ্জী (এখন রায় সাহেব) যথাসময়ে পাকা কালেক্টার হইবার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

বঙ্গসাহিত্যে নূতন-পঞ্জিকা-ফলশ্রুতি

শ্রীসূর্য্যায় নমঃ

হরপার্ব্বতী-সংবাদ ।

হরপ্রতি প্রিয়ভাষে কন হৈমবতী ।
বৎসরের ফলাফল কহ পশুপতি ॥
বঙ্গের সাহিত্য-ক্ষেত্রে কোন্ কল্প হয় ।
কোন্ কোন্ যুগ গত কাহার উদয় ॥
কোন্ যুগে কেবা রাজা কোন্ অবতার ।
পাপ-পুণ্য-ভাগ কিবা যুগধর্ম্ম আর ॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ

অথ শ্বেতবরাহকল্পাব্দাঃ ১৯২৪ বৎসর গত। তত্র ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হাল্‌হেড সাহেব সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন এবং উইলকিন্‌স্ সাহেব বঙ্গাক্ষরের মুদ্রাযন্ত্র প্রস্তুত করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ফরষ্টার সাহেব প্রথম বাঙ্গলা অভিধান সঙ্কলন করেন। এই সময়ে শ্রীরামপুরে উইলিয়াম কেরি, মার্সম্যান প্রভৃতি খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণের চেষ্টায় বাঙ্গলা গদ্যরচনা আরম্ভ হয়। সুতরাং ১৮০০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গসাহিত্যের

সত্যযুগোৎপত্তি

এই যুগের পরিমাণ ৬০ বৎসর। এই যুগের অবতার রাজা রামমোহন রায়। তিনি মীনরূপ ধারণ করিয়া প্রলয়পয়োধিজল হইতে বেদের উদ্ধার করিয়া বেদান্তধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন এবং নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া খৃষ্টান মিশনারী দিগের সহিত ভীষণ সংগ্রাম করিয়াছিলেন।

এই যুগের সম্রাট্—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর; সামন্ত-নৃপতিগণ—মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, মাইকেল্ মধুসূদন দত্ত।

যুগারম্ভে বাঙ্গলা গদ্য দেবভাষার সদৃশ ছিল, যথা—"শার্দ্দূলের ভয়ঙ্কর গর্জ্জনাকর্ণন, বিসঙ্কট বদনব্যাদান, বিকট দংষ্ট্রাকড়মড়ি, ঘন ঘন লাঙ্গুলাঘাত চট্‌চট্ শব্দ, ভীম লোচনদ্বয়ের ঘূর্ণনেতে অত্যন্ত সংত্রস্ত"—ইত্যাদি।

ইহার রচয়িতার নাম এই ভাষার অনুরূপ অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। তিনি সিভিলিয়ানদের বাঙ্গলা শিক্ষার জন্য এইরূপ ভাষায় পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। এই যুগের পদ্যের নমুনা মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত বাসবদত্তা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:—

কামিনীর সজ্জা

"স্বর অলসে মৃদু-হসনা।
তনু উলসে মদ লসনা॥
জঘন-তটে ধৃত-রশনা।
অধরপুটে স্মিতদশনা॥
জিত বরটা গজগমনা।
অরুণঘটা সম বরণা।
কনকছটা জিনি বরণা।
চমরসটা কচ-রচনা॥
ভণতি যথাগতমতিনা।
কবি মদন দ্রুতগতিনা॥"

এই মদনমোহন তর্কালঙ্কারই যে আবার সরল সুমিষ্ট খাঁটি বাঙ্গলায় "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল"—কবিতাটি রচনা করিয়া অমর হইয়াছেন, তাহা এই বাসবদত্তা পড়িয়া কে অনুমান করিবে?

যে ঈশ্বর গুপ্ত পরমেশ্বরের মহিমবর্ণনপ্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন,—

"রে মন! পরম পুরুষের প্রেম-পুষ্পের আমোদের আঘ্রাণ একবার নে রে—একবার নে রে,—শোন্ রে শোন্ রে; ভূতনাথকে একবার দেখ্ রে—একবার দেখ্—রে; মন রে—মন রে—শোন্ রে—শোন্ রে; ও মন, ব্রহ্মরসে গল্ রে—গল্—রে—গল্—রে।" ইত্যাদি। তিনিই আবার কেমন সুললিত ছন্দে এই শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীতটি রচনা করিয়াছিলেন, দেখুন—

"কে রে বামা বারিদবরণী, তরুণী ভালে ধরেছে তরণী,
কাহার ঘরণী আসিয়া ধরণী করিছে দনুজ জয়।
হের হে ভূপ! কি অপরূপ, অপরূপ নাহি স্বরূপ,
মদন-নিধন-করণ-কারণ চরণ শরণ লয়॥
বামা—হাসিছে ভাসিছে, লাজ না বাসিছে,
হুহুঙ্কার রবে সকল শাসিছে,
নিকটে আসিছে বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ হয়।
বামা—টলিছে ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে, সঘনে চলিছে
গগনে চলিছে,
কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে, ছলিছে ভুবনময়॥"
ইত্যাদি।

এই প্রকার বিবিধ লেখকের বিভিন্নাকৃতির ভাষা কালক্রমে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রভাবে সুমার্জ্জিত ও সমতা প্রাপ্ত হইল।

তিনি বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর বাঙ্গলা পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়া বহুকাল যাবৎ বঙ্গসন্তানদিগকে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের ভাষা অবশ্যই পণ্ডিতী ভাষা ছিল, কিন্তু তাহা প্রাঞ্জল, সুবোধ্য ও সুমার্জ্জিত ছিল, যথা—

"যে স্থানে ত্রেতাবতার ভগবান্ রামচন্দ্র দশাননের বংশ ধ্বংশকরণাভিপ্রায়ে মহাকায় মহাবল কপিবলসাহায্যে শত যোজন বিস্তীর্ণ অর্ণবোপরি কীর্ত্তি হেতু সেতুসংঘটন করিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, কল্লোলিনীবল্লভ প্রবাহমধ্য হইতে, অকস্মাৎ এক ভূরুহ উত্থিত হইল, তদুপরি এক সকললোকললামভূতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী চার্ব্বঙ্গী বীণাবাদন পূর্ব্বক গান করিতেছে।"

এই পণ্ডিতী ভাষার বিরুদ্ধে প্যারীচাঁদ মিত্র দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার "আলালের ঘরের দুলাল" রচনা করিলেন। তাঁহার ভাষার নমুনা এই,—

"শ্যামের নাগাল পালাম না গো সই—ওগো মরমেতে ম'রে রই,—টক্ টক্ পটাস্ পটাস্—মিয়াজান গাড়োয়ান এক একবার গান করিতেছে—টিট্‌কারি দিতেছে ও শালার গরু চল্‌তে পারে না ব'লে লেজ মুচড়াইয়া সপাৎ সপাৎ মারিতেছে।"

আবার মাইকেল মধুসূদন দত্ত যুগসন্ধিসময়ে যে মহাকাব্য রচনা করেন, তাহাতে আভিধানিক ভাষা চরমে উঠিয়াছিল। তাঁহার সেই ভাষাকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য ঢাকা জেলার মানকুণ্ডনিবাসী জগদ্বন্ধু ভদ্র যে ছুছুন্দরী কাব্য রচনা করেন, তাহার নমুনা এই,—

"দ্রুহিণবাহন সাধু অনুগ্রহণিয়া
প্রদান সুপুচ্ছ মোরে—দাও চিত্রিবারে,
কিম্বিধ কৌশলবলে শকুন্ত দুর্জ্জয়
পললাশী বজ্রনখ আশুগতি আসি

পদ্মগন্ধা ছুছুন্দরী সতীরে হানিল ?
কিরূপে কাঁপিল ধনী নখর-প্রহারে,
যাদঃপতি-রোধঃ যথা চলোর্ম্মি-আঘাতে।"

কিন্তু এই মধুসূদনই আবার তাঁহার ব্রজাঙ্গনা ও অন্যান্য কাব্যে যে সরল সুমিষ্ট ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্যে তাহার তুলনা নাই।

এই যুগের সাহিত্যে সৃষ্ট নরনারীর সংখ্যা অতীব বিরল, কারণ অধিকাংশ গ্রন্থই অন্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদ অথবা ছাত্রদিগের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক। তখন সেই আদিযুগের মানব-মানবী পশ্চিমদেশীয় জ্ঞান-বৃক্ষের ফল আস্বাদন করে নাই। দেশের বৈষ্ণব-কবি-বর্ণিত বৃন্দাবনের প্রেম তখনও দেবতার লীলা, সুতরাং মানব-সমাজে অনাচরণীয় বলিয়া গণ্য হইত। সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পরকীয় প্রীতি "পীরিত" বলিয়া ঘৃণার বস্তু ছিল, সৎসাহিত্যে মাথা তুলিতে পারিত না। তখনও সাহিত্য ও সুনীতির মধ্যে ব্যবধান কল্পিত হয় নাই।

অতএব সেই সত্যযুগের সাহিত্যে– "পুণ্যং পূর্ণং পাপং নাস্তি।"

অথ ত্রেতাযুগোৎপত্তি

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন দত্তের মেঘনাদ-বধ ও ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুর্গেশ-নন্দিনী প্রকাশিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যের এক একটি দিক্ আলোকিত করে। সুতরাং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ত্রেতাযুগের উৎপত্তি। তাহার স্থিতিকাল ৩০ বৎসর।

এই যুগের অবতার একাধারে রাম কৃষ্ণ। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা দ্বারা সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইলে স্বীয় আচরণ ও উপদেশ দ্বারা ধর্ম্ম-সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

এই যুগের সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; তাঁহার সামন্ত-নৃপতিগণ— দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি।

পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহার আলালী ভাষার দ্বারা পণ্ডিতী ভাষার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই উভয় প্রকার ভাষার মধ্যে একটি Golden mean অর্থাৎ উৎকৃষ্ট মধ্যপথ আবিষ্কার করিয়া সেই বিরোধের মীমাংসা করেন। তিনি "লুপ্ত-রত্নাকর"এর ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—

"বাঙ্গলা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু আলালের ঘরের দুলালের পর হইতে লোকে জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা আদর্শ বাঙ্গলা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।" কিন্তু সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেন,—"দুর্গেশনন্দিনী-কপালকুণ্ডলা লিখিবার সময় বঙ্কিম বাবু যে সম্যক্প্রকারে এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, এমন আমার বোধ হয় না। তাঁহার ভাষায় 'লম্ফ প্রদান' 'নিদ্রাগমন' প্রভৃতি সমস্ত পদ লইয়া কায়স্থকুলভূষণ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিবিধার্থ-সংগ্রহে বিদ্রূপাত্মিকা সমালোচনা করিয়াছিলেন। পরে অনেক বিচার-বিতর্কের পর বঙ্কিম বাবু বিষবৃক্ষে 'গরু ঠেঙ্গাইতে' লাগিলেন।"

ক্রমশঃ বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাই আদর্শ গদ্যের ভাষা বলিয়া গৃহীত হইল। তবে কালীপ্রসন্ন ঘোষ সংস্কৃতশব্দ বহুল গদ্যেরই অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার রচিত প্রগাঢ় ভাবসম্পন্ন প্রবন্ধাবলীতে এই ভাষা মানাইতও ভাল।

এই যুগে পাশ্চাত্য নভেলের অনুকরণে বিস্তর উপন্যাস রচিত হইয়া তৎসঙ্গে অনেক নরনারীর সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু তাহারা প্রায় সকলেই খাঁটি বাঙ্গালী, তাহারা প্রায়ই বিলাতী ধরণে প্রেম করে না। বঙ্কিমচন্দ্রের কোন কোন চরিত্রে কতকটা বিলাতী ভাবের ছায়া পড়িয়াছে। তিনি গভীর ট্রাজেডি সৃষ্টির অভিলাষে আয়েষা, কুন্দনন্দিনী, শৈবলিনী গড়িয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আর্ট অধিকাংশ স্থানেই স্বভাব ও বাস্তবের অনুগামী হইয়া স্বচ্ছন্দগতিতে চলিয়াছে, সুনীতির সহিত দ্বন্দ্ব করে নাই। এই যুগের সাহিত্যে পাপচিত্র যথেষ্ট আছে, কিন্তু কবির আর্ট কখনও পাপকে চিত্তাকর্ষক করিয়া চিত্রিত করে নাই, অথবা তাহাকে পুণ্যের মর্য্যাদা প্রদান করে নাই, বরং তাহাকে যথোচিত দণ্ড দিয়াছে। সুতরাং এই ত্রেতাযুগে,—

"পুণ্যং ত্রিপাদং পাপমেকপাদম্।"

অথ দ্বাপর যুগোৎপত্তি

যে দিন ওষধিপতি বঙ্কিমচন্দ্রের পশ্চিমাকাশে অস্তগমন করিবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বাকাশে অরুণ-রাগ বিকীরণ করিতে করিতে তরুণ রবি উদিত হইলেন, সেই দিনই বঙ্গসাহিত্যে দ্বাপরযুগের উৎপত্তি। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস সীতারাম প্রকাশিত হয়। সেই সময়ে রবীন্দ্র নাথের মানসী বাহির হইয়াছে, তখন তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। সুতরাং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে দ্বাপরযুগোৎপত্তি। পরে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন গীতাঞ্জলি প্রকাশ করিয়া বিশ্বব্যাপী কবিযশঃ অর্জ্জন করেন, তখন তিনি বঙ্গসাহিত্য-গগণের মধ্যাহ্নভাস্কর। সুতরাং এই দ্বাপরযুগের স্থিতি অনুমান ৩০ বৎসর।

এই যুগের অবতার রামকৃষ্ণশিষ্য বিবেকানন্দ স্বামী। তিনি হিন্দু-জাতিকে পাশ্চাত্য মোহাবরণ-নির্ম্মুক্ত করিয়া আত্মবোধে জাগ্রত

করিয়াছেন, এবং বুদ্ধদেবের ন্যায় দরিদ্রের দুঃখে কাতর হইয়া সেবাধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

এই যুগের সাহিত্যসম্রাট্ শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; তাঁহার সামন্ত নৃপতিগণ—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি। আমি জীবিত সাহিত্যরথীদিগের নাম করিলাম না।

ত্রেতাযুগে বঙ্কিমচন্দ্র পণ্ডিতী বাঙ্গলা ভাঙ্গিয়া যে সরল গদ্যের ভাষা প্রচলন করিয়াছিলেন, কালক্রমে তাহা কাহারও কাহারও মতে অচল হইয়া পড়িল। তাঁহারা কলিকাতার কথোপকথনের ভাষাকে "চল্‌তি-ভাষা" নাম দিয়া সাহিত্যরচনার জন্য সাধু ভাষার বিরুদ্ধে খাড়া করিলেন। ইহা লইয়া "চল্‌তি ভাষা বনাম সাধু ভাষা" নামক একটি মোকদ্দমার সৃষ্টি হইল। পরে ১৩২২ সনের চৈত্রমাসের 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত "ভাষার কথা" নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে রায় প্রকাশ করেন, তাহা দ্বারা এই মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়। সেই রায়ের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"আমি ছোট বেলা হইতে সাহিত্য রচনায় লাগিয়াছি। * * * যে ভাষা পুঁথিতে পড়িয়াছি, সেই ভাষাতেই চিরদিন পুঁথি লিখিয়া হাত পাকাইয়াছি। * * * * ক্ষণিকায় আমি প্রথম ধারাবাহিকরূপে প্রাকৃত বাঙ্গলা ও প্রাকৃত বাঙ্গলার ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, ক্ষণিকায় আমি কোন পাকা মত খাড়া করিয়া লিখি নাই, লেখার পরেও একটা মত যে দৃঢ় করিয়া চলিতেছি, তাহা বলিতে পারি না। আমার ভাষা রাজাসন এবং রাখালী, মথুরা এবং বৃন্দাবন কোনটার উপরেই দাবি সম্পূর্ণ ছাড়ে নাই। * * * এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, সাহিত্যে আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি, ক্রমে ক্রমে তার

একটা বিশিষ্টতা দাঁড়াইয়া যায়। তাহার প্রধান কারণ, সাহিত্যে আমাদিগকে সম্পূর্ণ করিয়া চিন্তা করিতে এবং সম্পূর্ণ করিয়া ব্যক্ত করিতে হয়, আমাদিগকে গভীর করিয়া অনুভব করিতে এবং তাহা সরস করিয়া প্রকাশ করিতে হয়। অর্থাৎ সাহিত্যের ক্ষেত্র নিত্যের ক্ষেত্র। অতএব এই উদ্দেশ্যে ভাষাকে বাছিতে, সাজাইতে ও বাজাইতে হয়। এই জন্যই সাহিত্যের ভাষা মুখের ভাষার চেয়ে বিস্তীর্ণ ও বিশিষ্ট হইয়া দাঁড়ায়। * * * * তবে প্রতিদিনের যে ভাষার খাতে আমাদের জীবন-স্রোত বহিতে থাকে, সাহিত্য আপনার বিশিষ্টতার অভিমানে তাহা হইতে যত দূরে পড়ে, ততই তাহা কৃত্রিম হইয়া উঠে। চির প্রবাহিত জীবনধারার সঙ্গে সাহিত্যের ঘনিষ্ঠতা রাখিতে তাহাকে এক দিকে সাধারণ ও আর এক দিকে বিশিষ্ট হইতে হইবে।”

বলা বাহুল্য, সাহিত্য-সম্রাট এখানে মথুরার রাজ ভাষাতেই তাঁহার রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার “ঘরে-বাইরে” উপন্যাসে রাখালী ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সম্রাটের এই রায় প্রকাশ হওয়ার পরে চল্‌তি ভাষা লইয়া আর কোন উচ্চবাচ্য শোনা যায় নাই।

এই যুগে কবিতা, নাটক, উপন্যাস বর্ষার বারিধারার ন্যায় প্রবলবেগে বাহির হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র গল্প যে কত বাহির হইয়াছে, তাহার লেখাজোখা নাই। বাঙ্গালীর গার্হস্থ্যজীবনে দাম্পত্যপ্রেম, সখ্য ও বাৎসল্য রস যথেষ্ট পরিমাণেই আছে, কেবল এইগুলি লইয়া কাব্য রচনা করিতে গেলে তাহা বৈচিত্র্যহীন ও একঘেয়ে হইয়া পড়ে। সে জন্য অনেক গ্রন্থকার বিলাতী প্রেমের আমদানী করিয়া তদবলম্বনে গল্প ও উপন্যাস রচনা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহাতে অনেক স্থলে দেশপ্রচলিত সামাজিক আদর্শ ও ধর্ম্মনীতি ক্ষুণ্ণ হইল। তখন “art for art's

sake" এই আইন প্রচারিত হইল এবং মোরালিটীর সহিত আর্টের দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল। কিন্তু উভয়েরই তুল্য বল থাকায়, দ্বাপরযুগের সাহিত্যে—

"পুণ্যমর্দ্ধং পাপমর্দ্ধম্।"

অথ কলিযুগোৎপত্তি

দ্বাপরযুগের সাহিত্য-সম্রাট আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ এখনও পশ্চিমাকাশে উজ্জ্বল আলোক বিকীরণ করিতেছেন, কিন্তু বিগত ১০।১৫ বৎসর হইতে বঙ্গসাহিত্যে কলির হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়া ভবিষ্যৎ যুগবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। শ্রীযুত শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই যুগের ভাবী সম্রাট বলিয়া জয়মাল্য লাভ করিয়াছেন।

সম্রাট রবীন্দ্রনাথ এখন মথুরার রাজভাষা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া কেবল কাব্য-উপন্যাসাদিতে নহে, প্রগাঢ় ভাবসম্পন্ন রচনাতেও বৃন্দাবনের রাখালী ভাষা ব্যবহার করিতেছেন। তদনুসারে অনেক লেখক কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী দুই তিনটা জিলার মৌখিক ভাষাকেই সাহিত্যের ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা দিতেছি,—

"সত্যি আমি বড্ড ভালবেসেছিলুম তাকে; অত ভাল বোধ হয় তখন আর কাউকে বাসিনি। সে আমার কুমারীর প্রাণে কি মায়াবলে হঠাৎ অতখানি ভালবাসার সঞ্চার ক'রে ফেলেছিল, তা এখনও কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনি। শুধু বুঝেছি, আমাদের সেই ভালবাসার ভেতর আবিলতার লেশমাত্রও ছিল না; শুধু ছিল একটা মিষ্টি মধুর মাদকতা—একটা তন্ময় ভাব। আমরা দু'জনে দু'জনকে কাছে পেলেই যথেষ্ট সুখী হোতুম; অন্য কেউ এসে বাধা জন্মালে আর বিরক্তির অবধি থাকতো না। না—না, তার বাড়ী কোথায় ছিল, আমায় জিজ্ঞেস কোর্ব্বেন না; আমি বোল্‌তে পারবো না। তার নাম? তা'ও জান্‌তুম না; তবে—হ্যাঁ, আমি আদর ক'রে তার নাম রেখেছিলুম 'দুলাল'।"

গল্প, উপন্যাস লিখিতে এই মৌখিক ভাষা মানায় ভাল; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথায়—যে সকল ভাব আমাদিগকে গভীর করিয়া অনুভব করিতে হয়, তাহা প্রকাশ করিতে এ ভাষা আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। আবার এই ভাষার সঙ্গে যে অঞ্চলের লোকের প্রতিদিনের জীবন-স্রোত বহিতেছে, তাহাদের পক্ষে ইহা অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক। কিন্তু সেই অঞ্চলের বাহিরের লোকের পক্ষে ইহা কৃত্রিম। যে দুই একটি পূর্ব্ববঙ্গের খ্যাতনামা সাহিত্যিক এই কলিকাতার মৌখিক ভাষায় গ্রন্থরচনা করিয়াছেন, তাঁহারা নিতান্ত হাস্যাস্পদ হইয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকা হয় ত গভীর বিষয় চিন্তা করিয়া পড়িতে দিন দিন অশক্ত হইতেছেন। তাঁহারা তরল সাহিত্য তরল ভাষায় পড়িতে অভ্যস্ত হইতেছেন। আমার বোধ হয়, সেই জন্য এই ভাষা অধিক প্রসার লাভ করিতেছে এবং গল্প ও উপন্যাস এ যুগের সাহিত্যক্ষেত্র দখল করিয়া বসিয়াছে।

সেই সকল গল্প ও উপন্যাসে প্রেমের কাহিনী সমাজে প্রচলিত সোজা পথে না চলিয়া বৈচিত্র্যের অনুরোধে নানা প্রকার উৎকট ও বীভৎস আকার ধারণ করিতেছে। কবির আর্ট এখন মোরালিটীর সহিত সংগ্রামে জয়ী হইয়া মাথায় লাল পাগড়ী ও হাতে রেগুলেসন লাঠি লইয়া সে বেচারীকে "চোখ রাঙ্গাইয়া" বলিতেছে, "হট যাও!" সুতরাং এই কলিযুগের সাহিত্যে—

"পুণ্যমেকপাদং পাপং ত্রিপাদম্।"

এখন কবে কোন্ মহাপুরুষ অবতাররূপে আবির্ভূত হইয়া এই কলির পাপপুণ্যের সামঞ্জস্যবিধান পূর্ব্বক সাহিত্য ও সমাজের মঙ্গল-সাধন করিবেন?

বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব ১৩৫০

বঙ্গীয় ১৩৫০ সনে, কলিকাতা মহানগরীতে "নিখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভা"র এক বিশেষ অধিবেশন হইল। এই অধিবেশনে ভারতের নানাস্থান হইতে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, আর্য্যসমাজী, ব্রাহ্ম প্রভৃতি সভ্যগণ কেহ সাধারণ রেলগাড়ীতে, কেহ বৈদ্যুতিক রেলে, কেহ এরোপ্লেনে আসিয়া কলিকাতায় সমবেত হইলেন। হ্যালিডে পার্কের মধ্যে এক বিশাল পটমণ্ডপ তলে সভার অধিবেশন হইল। সভায় বাঙ্গালী সভ্য অপেক্ষা মাদ্রাজী, মহারাষ্ট্রী, পাঞ্জাবী, মাড়ওয়ারী সভ্যই বেশী দেখা গেল। কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চলের অধিকাংশ গণ্যমান্য মাড়ওয়ারী উপস্থিত ছিলেন—যথা রাজা হীরালাল সুখন চাঁদ, রায় বাহাদুর মাণিকচাঁদ কুঠারি, চুনীলাল পান্নালাল, জহরলাল মতিলাল, মোহনলাল রূপলাল প্রভৃতি।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে মহাস্থবির অমৃতকান্তি ঘোষ ভাগবতভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া সভা আহ্বানের কারণ এইরূপ বিবৃত করিলেন,—

"সভ্য মহোদয়গণ! আপনারা অনেকে বহুদূর হইতে এই সভায় যোগদান করিবার জন্য বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, সে জন্য আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। আজ ২০ বৎসরের অধিক কাল হইল হিন্দু মহাসভা স্থাপিত হইয়াছে। আমার মাথার চুল তখন সব কালো ছিল, আজ দেখুন সেগুলি সব সাদা হইয়াছে। (করতালি) ইহার উদ্দেশ্য ছিল, ভারতবর্ষে হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, আর্য্যসমাজী, ব্রাহ্ম প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একীভূত ও ঘনীভূত করিয়া এক বিশাল মহা

হিন্দুজাতি সংগঠন করা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের সেই মহান্ উদ্দেশ্য কিছুমাত্র সংসাধিত হয় নাই। যদিও হিন্দুসমাজের জাতিভেদ ও স্পর্শদোষ অনেক পরিমাণে শিথিল হওয়ায় এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের একত্র পানভোজনাদি চলিতেছে, কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে একপ্রাণতা কোথায়? তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের ঘোরতর বৈষম্যই এই সকল সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এখন হিন্দুমহাসভার অন্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যেগুলি ঐক্যসূত্র আছে তাহা বাছিয়া বাহির করিয়া তদবলম্বনে একটা বিরাট ধর্ম্মমহোৎসব প্রতিষ্ঠা করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। বঙ্গদেশে দুর্গোৎসব হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রধান জাতীয় মহোৎসব। ইহার মধ্যে প্রতিমা পূজা বা তথাকথিত পৌত্তলিকতা আছে সত্য, যাহা নিরাকারবাদী ও আর্য্যসমাজীদের আপত্তিজনক সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা প্রতিমাস্থ দেবতাদিগের আধ্যাত্মিক ভাব যদি ধীরভাবে অনুসন্ধান করি, তবে আমার বোধ হয় আপত্তির কারণ অন্তর্হিত হইয়া যাইবে।

"দশভূজা দুর্গামূর্ত্তি আমাদের মঙ্গলময়ী মাতার মূর্ত্তি। তিনি দশ হস্তে বিবিধ প্রহরণ ধারণ করিয়া দশদিক রক্ষা করিতেছেন, এবং পাপরূপী অসুরকে বিনাশ করিতেছেন। তিনি হইতেছেন জগতের শক্তিমূর্ত্তি (vital energy)—যে মহাশক্তি দ্বারা বিশ্ব সংসার চালিত হইতেছে। তাঁহার দক্ষিণে সিদ্ধিদাতা গণেশ এবং ধনসমৃদ্ধির মূর্ত্তি লক্ষ্মীদেবী। তাঁহার বামে শৌর্য্যবীর্য্যের প্রতীক দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় এবং জ্ঞান বিদ্যা ও শিল্পকলার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী। আমাদের জাতীয় জীবনে সিদ্ধি, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য এবং বিদ্যা সকলই আবশ্যক। আমাদের জাতীয় জীবনে এই সব-গুলি গুণের একত্র সমাবেশ হইলেই তবে আমরা মহাশক্তির উদ্বোধন করিয়া সিংহবিক্রমে অসুর নাশ করিতে সমর্থ হইব। অতএব আমার

সানুনয় প্রস্তাব এই, আসুন আমরা সকল মতাবলম্বী মিলিত হইয়া বাঙ্গালীর এই জাতীয় মহোৎসবকে ভারতীয় হিন্দুর মহোৎসবে পরিণত করি। এখন আমার প্রস্তাব সম্বন্ধে আপনাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গের মতামত শুনিতে ইচ্ছা করি।”

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে বৌদ্ধাচার্য্য সংঘশরণ ভিক্ষু গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন,—

“মাননীয় সভাপতি মহাশয়! আপনার প্রস্তাব অতীব সমীচীন। হিন্দুদিগের দুর্গোৎসবকে একটি মহাজাতীয় অনুষ্ঠানে পরিণত করা সম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ মত আছে। দুর্গোৎসবে যে তারা, চামুণ্ডা, উগ্রচণ্ডা প্রভৃতি দেবতার পূজা হয়, আমার বিশ্বাস, সেগুলি বৌদ্ধ দেবতা। প্রতিমার চালের উপর যে শিবঠাকুর বসিয়া থাকেন, মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে তিনি ধর্ম্ম ঠাকুর। নব পত্রিকায় যে নয়টি উদ্ভিদের পূজা করা হয় তাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও শাস্ত্রী মহাশয় দিয়াছেন। এখন প্রতিমাস্থ দেবতাদের মধ্যে যদি একটি বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বসাইয়া দেওয়া হয়, তবে আমরা সন্তোষের সহিত এই মহাপূজায় যোগদান করিতে পারি।”

অতঃপর জৈন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি আচার্য্য গণপৎ শুক্লাম্বর বলিলেন,—

“আমাদেরও এই প্রস্তাবে কোন আপত্তির কারণ নাই। আমরা লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণপতি প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকি, সুতরাং দুর্গোৎসবেও যোগদান করিতে পারি। তবে এই সকল দেব-দেবীর সঙ্গে আমাদের মহাবীরের একটি মূর্ত্তি যদি যোগ করিয়া দেওয়া হয় এবং ছাগলাদি পশুবলি যদি রহিত হয়, তবে আমরা এই জাতীয় মহোৎ-সবে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিব।”

অনন্তর আর্য্য সমাজের অন্যতম নেতা স্বামী কৃপানন্দ বলিলেন,—"আমাদের আর্য্য সমাজের উপাসনা প্রণালীতে দেব দেবীর প্রতিমা পূজা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, তবে আমরা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে হবন করিয়া থাকি। দুর্গোৎসবেও আপনারা হোম করেন। ঐ সকল প্রতিমা পূজা তুলিয়া দিয়া যদি কেবল ঘট স্থাপন করিয়া হবনের ব্যবস্থা করা হয়, তবে আমরা এই উৎসবে যোগদান করিতে পারি। রাজপুতানা, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশে দুর্গোৎসবে প্রতিমা পূজা হয় না, কেবল ঘটস্থাপন পূর্ব্বক চণ্ডীপাঠ ও হোম হইয়া থাকে। রাজপুতগণ যুদ্ধের প্রতীকরূপ খড়্গ বা অসির পূজাও করেন।"

তৎপরে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি আচার্য্য সচ্চিদানন্দ বিশারদ বলিলেন,—

"আমরা নিরাকারবাদী, নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসক। কোন প্রকার পৌত্তলিকতা আমরা সহ্য করিতে পারি না। এমন কি বৈদিক হোমাদিও আমরা মানি না। আমরা চন্দ্রসূর্য্য, গ্রহনক্ষত্র, জলস্থল, পর্ব্বতসমুদ্র প্রভৃতি অবলম্বনে ঈশ্বরোপাসনা করি। বেদান্তেও এইরূপ প্রতীকোপাসনার উল্লেখ আছে—যেমন সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি। যদি এরূপ একটি প্রতীক আবিষ্কার করা যায়, যাহার মধ্যে দুর্গা প্রতিমাস্থিত শক্তি-সিদ্ধি-ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য-বিদ্যা প্রভৃতি সবগুলি ভাব একত্র সমাবিষ্ট, তবে আমরা চক্ষু মুদিয়া তাহার ধ্যান করিতে পারি, কিন্তু বাহিরের পূজা আমরা মানি না।"

এইরূপে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ আপন আপন অভিমত প্রকাশ করিলেন। সভাপতি মহাস্থবির অমৃতকান্তি ঘোষ মহাশয় সভাস্থ সকলকে ধ্যানে বসিতে আদেশ করিলেন। পাঁচমিনিট কাল সভাস্থ সকলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান-নিমগ্ন রহিলেন। পরে রায় বাহাদুর মাণিক চাঁদ কুঠারি নামক একজন বৃদ্ধ মাড়োয়ারী দাঁড়াইয়া বলিলেন,—

"বাবু সাহেব, আমি পাইয়াছি—পাইয়াছি—Eureka Eureka! আপনারা সকলে আশ্বস্ত হউন। আমি ধ্যানযোগে এরূপ একটি প্রতীক বা দেবশক্তি আবিষ্কার করিয়াছি, যাহা আপনারা সকল সম্প্রদায় বিনা আপত্তিতে প্রসন্নচিত্তে পূজা করিতে পারেন। আমরা পূর্ব্ব হইতেই ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাহার উপাসনা করিয়া আসিতেছি; সুতরাং আমি নূতন কিছু আপনাদের কাছে উপস্থিত করিব না। তাহার নাম **টাকা**। কোন একটি সাধক ইতিপূর্ব্বে বিষ্ণুর বা দুর্গার শতনামের ন্যায় টাকারও শতনাম রচনা করিয়াছেন, এবং উৎসাহ পাইলে তিনি ইহার সহস্র নামও রচনা করিতে পারেন। আমাদের মাড়োয়ারীদের দুর্নাম আছে যে কেবল আমরাই এই দেবতার পরম ভক্ত; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বাঙ্গালী বাবু সাহেবদের ত কথাই নাই, সকল প্রদেশের সকল সম্প্রদায়ের লোকেই কোন না কোন প্রকারে এই দেবতার উপাসনা করেন। ইহার উপাসক সংখ্যা বিগত ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়াছে, এবং কালক্রমে আরও বাড়িবে। আপনারা দুর্গা-প্রতিমায় ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, বিদ্যা, সিদ্ধি, শক্তি প্রভৃতি ভাবের সমষ্টি থাকা উল্লেখ করিয়াছেন, আমি বলি এক টাকাতেই ইহার সবগুলি বিদ্যমান। যাহার দশবিশ লক্ষ টাকা আছে, লোকে তাহাকেই বলে ঐশ্বর্য্যশালী। বর্ত্তমান যুগে যুদ্ধ করিতে হইলে শারীরিক বল বীর্য্য কোন কাযে লাগে না, এখন যাহাদের অধিক টাকা আছে এবং সেই টাকার দ্বারা নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অস্ত্রশস্ত্র, জাহাজ, এরোপ্লেন, বোমা, কামান, বিষাক্ত গ্যাস, ট্যাঙ্ক ইত্যাদি যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত করিতে পারে, তাহাদেরই জয় অবশ্যম্ভাবী। সকলেই জানেন, প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বেই য়ুরোপীয় মহাসমরে ইংরাজজাতি টাকার বলেই শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করিয়াছিল। আবার যখন তাহাদের তহবিল শূন্য হইয়া পড়িল, তখন

তাহারা কোথায় এমেরিকা কোথায় ভারতবর্ষ এই সব দেশে ভিক্ষার থলি হাতে করিয়া বাহির হইল। এমন কি ভারতের কৃষকদিগকেও স্থানে স্থানে লাঙ্গল প্রতি ৫৲ টাকা হারে এই ভিক্ষা দিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। অতএব বর্ত্তমান সময়ে বীর্য্য মানেই টাকা। আবার যাহার প্রচুর টাকা আছে, সেই ইচ্ছানুরূপ কবিত্ব, শিল্পকলা ও বিবিধবিষয়িণী বিদ্যার অনুশীলন করিয়া সমাজে গণ্য-মান্য হইতে পারে। অর্থহীন প্রতিভাশালী ব্যক্তির সফলতালাভের আশা খুবই কম। সুতরাং এই সকল বিদ্যায় কৃতিত্ব লাভের মূল—টাকা। সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি অর্থাৎ জীবনযুদ্ধে জয়লাভের মূল—টাকা। নির্ধন ব্যক্তির বুদ্ধি ও বিদ্যায় কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। তাহার প্রমাণ আপনাদের কতশত ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীবাবু। আমাদের মাড়ওয়ারীর ছেলেরা সে রকম লেখাপড়া না শিখিয়াও কিছু মূলধন সংগ্রহ করিয়া মস্ত একটা ব্যবসা ফাঁদিয়া বসে এবং দেখিতে দেখিতে লক্ষপতি হইয়া পড়ে। আর আপনাদের বাঙ্গালীর ছেলেরা বি এ, এম্ এ, পাশ করিয়াও যাবজ্জীবন ৩০৲।৪০৲ টাকায় মাষ্টারি করিয়া কাটায়। অতএব এতগুলি গুণ যে টাকার মধ্যে আছে, সেই টাকাই আলবৎ **সর্ব্বশক্তির মূল মহাশক্তি**—আপনারা হিন্দুরা যাহাকে বলেন দুর্গা। দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ, ইহাঁরা সকলেই টাকাতে বিরাজমান, অতএব টাকাকেই দুর্গা প্রতিমার স্থলে প্রতীক রূপে পূজা করা যাইতে পারে।”

মাণিকচাঁদ বাবুর বক্তৃতা শুনিয়া সভাস্থ সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। একটি বাঙ্গালী ইহার প্রতিবাদ করিতে উঠিলেন, কিন্তু চারিদিক হইতে “আপ বৈঠে” “আপ বৈঠে” ধ্বনি উত্থিত হইল দেখিয়া তিনি বসিতে বাধ্য হইলেন।

তখন মাণিকচাঁদ বাবু বলিলেন, "আমি এখন আপনাদের সকল সম্প্রদায়ের মনস্তুষ্টির জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি :—

"নিখিল ভারতবর্ষীয় হিন্দু মহাসভা ভারতের সমস্ত হিন্দু জাতির একতা স্থাপনের জন্য এক বিরাট দুর্গোৎসবের আয়োজন করিবেন। তাহাতে দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ, অসুর, সিংহের মূর্ত্তি গঠন না করিয়া কেবল ঘটস্থাপন করিয়া এবং সেই ঘটোপরি একটি রজতমুদ্রা স্থাপন করিয়া, পূজা করিবার প্রস্তাব এই সভা অধিকাংশের সম্মতিক্রমে গ্রহণ করিতেছেন। সেই সঙ্গে হোম ও চণ্ডীপাঠ করা যাইবে। আর পূজা মণ্ডপে প্রতিমার চালচিত্রের ন্যায় বুদ্ধদেব, মহাবীর, দয়ানন্দ সরস্বতী ও রাজা রামমোহন রায়ের চিত্রপট রাখা হইবে। এতদ্ভিন্ন কোন দেবদেবীর মূর্ত্তি রাখা নিষিদ্ধ হইল।"

অধিকাংশ সভ্যের সম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল। তখন টাকার সহস্রনাম, পূজাপদ্ধতি, পুঁথি, ধ্যান, স্তব কবচাদি রচনার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিতের একটি সাবকমিটি গঠিত হইল। অবশেষে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ করা হইল।

সাহিত্যের মানহানি মামলার বিচার

বিচারপতি—

সাহিত্য-সম্রাট্ মহামান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডি, লিট্, ইত্যাদি।

জুরিগণ—

১। শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (ফোরম্যান্)

২। রায় বাহাদুর শ্রীযুত জলধর সেন,

৩। শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী,

৪। শ্রীযুত পি, চৌধুরী,

৫। শ্রীযুত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

বাদী—

সরকার বাহাদুর।

প্রতিবাদী—

নব্য তন্ত্রের সাহিত্যিকবৃন্দ।

বেলা ১০টা, বিচার-গৃহ লোকে লোকারণ্য। তাহার মধ্যে অধিকাংশ স্কুল-কলেজের ছাত্র। ছোট বড় মাঝারি অনেক সাহিত্যিক উকীলগণের পশ্চাদ্‌ভাগে উপবিষ্ট।

মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইলে দেখা গেল, সরকার কে পক্ষে কোন সাহিত্যিক উকীল উপস্থিত নাই। তখন বিচারপতি, শ্রীযুত নীরেন্দ্র নাথ দত্ত এম, এ, বি এল, পি, আর, এস, বেদান্তরত্নকে হাজির পাইয়া তাঁহাকে সরকার-পক্ষ সমর্থন করিবার আদেশ দিলেন।

প্রতিবাদিগণের পক্ষে বহু উকীল উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীযুত ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্, এ, ডি, এল-কে সকলের অগ্রবর্ত্তী দেখা

গেল। তাঁহার পশ্চাতেই ছিলেন শ্রীযুত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এল।

জুরি-নির্ব্বাচনসময়ে প্রতিবাদী পক্ষের উকীল-প্রধান প্রথম তিন জন সম্বন্ধে এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিলেন,—

(১) শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় একজন প্রবীণ মাসিকপত্র সম্পাদক সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার নিজের স্বীকারোক্তিমতে তিনি সাহিত্যিক নহেন। তিনি এক জন নিতান্ত নীরস, শুষ্ক, ব্রাহ্ম পিউরিট্যান (puritan), তিনি কেবল রাজনৈতিক প্রবন্ধ লেখেন, সুতরাং রস-সাহিত্যের বিচারে তিনি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

(২) রায় বাহাদুর শ্রীযুত জলধর সেন অবশ্য ঝুড়ি ঝুড়ি গল্প উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি বস্তাবন্দী করিয়া হাইড্রলিক প্রেসে চাপ দিয়া নিংড়াইলেও তাহার মধ্য হইতে এক বিন্দু আদিরস বাহির হইবে না; সুতরাং তিনিও রস ও সাহিত্যের বিচারে অনুপযুক্ত।

(৩) শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী দীর্ঘকাল যাবৎ বঙ্গদেশের বাহিরে কাটাইয়া আসিয়াছেন, ইতিমধ্যে বঙ্গসাহিত্যে যে বিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তিনি তাহার খোঁজ রাখেন না। তিনি ভারতীতে স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনেক বই পড়িবার সুযোগ পান নাই, পরে পড়িয়াছেন কি না, তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় নাই। বিশেষতঃ তিনি স্ত্রীলোক, এ দেশে স্ত্রীজাতি জুরির বিচারে বসিবার অধিকার এ পর্য্যন্ত পান নাই।

উকীল সরকারের কোন প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বিচারপতি এই সকল আপত্তি না-মঞ্জুর করিলেন। শ্রীমতী সরলা দেবী সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, রস-সাহিত্যের পাঠকদের মধ্যে আজকাল অনেক নারী আছেন, নব্য সাহিত্যিকগণের তৈয়ারি রস তাঁহাদের চিত্তে কিরূপ ক্রিয়া

উৎপাদন করে, তাহা বিচারের জন্য ইঁহাকে জুরিতে রাখা একান্ত আবশ্যক।

অতঃপর উকীল-সরকার উঠিয়া দাঁড়াইয়া এক চক্ষু বিচারপতির প্রতি ও অপর চক্ষু জুরিগণের দিকে ন্যস্ত করিয়া অতি ধীরে এইরূপে case open (মোকদ্দমা আরম্ভ) করিলেনঃ—

মি লর্ড (My Lord)—শ্রীবিষ্ণু—মাননীয় বিচারপতি ও জুরি মহোদয়া ও মহোদয়গণ! আপনারা বোধ হয় জানেন, আমিও এক জন নীরস লোক। আমি বাড়ীতে অবসরমত বেদান্তচর্চ্চা করি, রাত্রে বিছানায় শুইয়া পরলোকতত্ত্বের গবেষণা করি, আর ভোরে উঠিয়া সেগুলি হজম করিবার জন্য হেদোর চারি ধারে সাত পাক ঘুরি। আমি আধুনিক বাঙ্গলা রস-সাহিত্যের আবর্ত্তন, বিবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তনের কোন খোঁজ-খবর রাখি না। তবে মহামান্য সাহিত্য-সম্রাট্ যখন আমাকে দয়া করিয়া এই মোকদ্দমায় সরকার-পক্ষ সমর্থনের আদেশ করিয়াছেন, তখন আমি তাঁহার আদেশ পালন করিতে বাধ্য। মি লর্ড—শ্রীবিষ্ণু, মাননীয় বিচার-পতি! আপনি বর্ত্তমান নব্য সাহিত্যিকগণের সম্বন্ধে যে অভিযোগ লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন অর্থাৎ আপনি যে "চার্জ্জ সিট" প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা আমি পাঠ করিয়াছি, এবং তাহা দ্বারা আমার কায অতি সহজ হইয়াছে। মাননীয়া জুরি মহোদয়া ও জুরি মহোদয়গণ! আপনারা একটু মনোযোগ দিয়া শুনুন, আমি সেই অভিযোগপত্র পাঠ করিতেছি। —আধুনিক সাহিত্যে যৌন-মিলনের জীবধর্ম্ম ও মানুষের চিত্তধর্ম্ম উভয়ের সীমানা বিভাগ নিয়ে এই মামলার উৎপত্তি হয়েছে। বংশরক্ষাঘটিত পশুধর্ম্ম মানুষের মনস্তত্ত্বে ব্যাপক ও গভীর, বৈজ্ঞানিক এমন কথা বলেন, কিন্তু সে হইল বিজ্ঞানের কথা,—মানুষের জ্ঞানে ও ব্যবহারে এর মূল্য আছে। কিন্তু রসবোধ নিয়ে যে সাহিত্য ও কলা, সেখানে এর সিদ্ধান্ত

স্থান পায় না।.......... সাহিত্যে যৌন-মিলন নিয়ে যে তর্ক উঠেছে, সামাজিক হিতবুদ্ধির দিক্ থেকে তার সমাধান হবে না, তার সমাধান হবে কলারসের দিক্ থেকে। অর্থাৎ যৌন-মিলনের মধ্যে যে দু'টি মহাল আছে, মানুষ তার কোন্‌টিকে অলঙ্কৃত ক'রে নিত্য কালের গৌরব দিতে চায়, সেইটাই হ'লো বিচার্য্য।...আজকালকার য়ুরোপীয় সাহিত্যে যৌন-মিলনের দৈহিকতা নিয়ে খুব যে একটা উপদ্রব চল্‌ছে, সেটার প্রধান প্রেরণা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, রেষ্টোরেসন যুগে সেটা ছিল লালসা। কিন্তু সেই যুগের লালসার উত্তেজনাও যেমন সাহিত্যের রাজটীকা চির-দিনের মত পায় নি, আজকালকার দিনের বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের ঔৎসুক্যও সাহিত্যে চিরকাল টিকতে পারে না। আমাদের দেশের ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর এবং ঈশ্বর গুপ্তের পাঁঠার উপর কবিতা যাহা এক সময়ে নাগরিক মহলে যথেষ্ট আদর পেয়েছিল, আধুনিক শিষ্ট-সাহিত্যের বাজারে তাহা অচল হয়ে বটতলা অঞ্চলে গা ঢাকা দিয়েছে। সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানী যে একটা বে-আব্রুতা এসেছে, সেটাকেও কেউ কেউ মনে করেছেন, নিত্য পদার্থ; ভুলে যান, যা নিত্য, তা' অতীতকে প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে আব্রু আছে, সেইটেই নিত্য; যে আভিজাত্য আছে—রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য; এখনকার বিজ্ঞানমদমত্ত ডিমোক্রাসি তাল ঠুকে বলবে, ঐ আব্রুটাই দৌর্ব্বল্য, নির্ব্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ। চিৎপুর রোডে হোলি-খেলা বা বসন্ত উৎসবের নামে নির্লজ্জ মাতলামির বা পাগলামির ন্যায় পরস্পরকে মলিন করার উন্মত্ততা মনস্তত্ত্বের নামে বাঙ্গলা সাহিত্যে এখন চলিতেছে। কিন্তু মানুষের রসবোধই যে উৎসবের মূল প্রেরণা, সেখানে যদি সাধারণ মলিনতায় সকল মানুষকে কলঙ্কিত করাকেই আনন্দ প্রকাশ বলা হয়, তবে সেই বর্ব্বরতার মনস্তত্ত্বকে এ ক্ষেত্রে অসঙ্গত বলেই আপত্তি করব, অসত্য ব'লে নয়।...সাহিত্য-রসের হোলিখেলায় কাদা মাখামাখির

পক্ষসমর্থন উপলক্ষে অনেকে প্রশ্ন করেন, সত্যের মধ্যে এর স্থান নাই কি? এ প্রশ্নটা অবৈধ। উৎসবের দিনে ভোজপুরীর দলের মাতলামি এবং মাদল-করতালের খচোমচো ও চীৎকার যে সত্য বস্তু, তাহা প্রশ্ন করাই অনাবশ্যক। যথার্থ প্রশ্ন হচ্ছে, এটা সঙ্গীত কি না? মাধুর্য্যহীন এই রূঢ়তাকেই যদি শক্তির লক্ষণ ব'লে মানতে হয়, তবে এই পালোয়ানির মত জাতিকে বাহাদুরী দিতে হবে, সে কথা স্বীকার করি। কিন্তু ততঃ কিম্! এই পৌরুষ চিৎপুর রাস্তায়, অমরাপুরীর সাহিত্যকলায় নয়। আধুনিক সাহিত্যে যে হট্টগোল দেখা দিয়াছে, তাহা সাহিত্যের কল্যাণে নয়, হাটের কল্যাণে। এই হট্টগোলই সাহিত্যের বাহাদুরী।"

অতএব সরকার পক্ষ হইতে আমি আধুনিক সাহিত্যের নামে নিম্নলিখিত অভিযোগ উপস্থিত করিতেছি :—

আধুনিক সাহিত্য যৌন-মিলনের দৈহিকতা নিয়ে যে একটা মস্ত উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে, তাহার তিনটা ওজুহতে দেওয়া হয়, যথা—(১) বৈজ্ঞানিক কৌতূহল-নিবৃত্তি, (২) আর্টের কারচুপি (৩) সত্যের উদ্‌ঘাটন; আধুনিক সাহিত্যের এই যে বে-আব্রুতা বিদেশের আমদানী, এই নির্ব্বিচার নির্লজ্জতার সহিত নিত্য-সাহিত্য-রসের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা দ্বারা বাণীর মন্দির কলুষিত হইতেছে এবং কলালক্ষ্মী কলঙ্কিত হইতেছেন।

হে জুরি মহোদয়া ও মহোদয়গণ! আমি এই অভিযোগ সমর্থনের জন্য প্রমাণ-প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত আছি।

উকীল-সরকার আসন গ্রহণ করিলে প্রতিবাদিগণের উকীল-প্রধান তীরবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি জুরিদিগের দিকে মুখ ফিরাইয়া বুক টান করিয়া দুই পকেটে দুই হাত পুরিয়া চেয়ারের উপর এক পা তুলিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন :—

জুরি মহোদয়া ও মহোদয়গণ! আজ এ 'কী' শুনিলাম! এ যে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! সাহিত্যক্ষেত্রে আমার একজন বন্ধু আছেন,

যাঁহার ন্যায় মূর্খ এ পৃথিবীতে আর একটি নাই, অথচ তিনি সেই মূর্খতার গর্ব্ব করিয়া থাকেন। "রসসৃষ্টি ও রসের নির্ম্মল আনন্দ উপভোগের বিধিদত্ত অধিকারে বঞ্চিত" সেই ব্যক্তিকে আমরা সাহিত্যের "স্যানিটারি ইনস্‌পেক্টার" বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া থাকি। কিন্তু উকীল-সরকার নব্য-সাহিত্যিকদিগের বিষয়ে যে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন, এ যে একরকম তাঁহারইকথা! বঙ্গ-সাহিত্যে নূতন "ভাবগঙ্গার ভগীরথ" যাঁকে 'নিত্য নূতন রসের পূজারি", "সাহিত্যের নূতন ধারার মন্ত্রগুরু ও অগ্রদূত বলিয়া নব-সাহিত্য এতদিন পূজা করিয়া আসিয়াছে" আজ তাঁহার মুখে এ 'কী' শুনিলাম! জুরি মহোদয়া ও মহোদয়গণ! আমি কে, তাহা আপনারা জানেন কি? গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনের ন্যায় আমি একজন সাহিত্যরথী, আমি নব্যসাহিত্যিকগণের সেনাপতি। আমি যে দ্রোণাচার্য্যের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছি, কর্ত্তব্যের অনুরোধে, সেই গুরুদেবের অঙ্গে অস্ত্র-নিক্ষেপ করিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না। বড়ই আক্ষেপের বিষয়, আমরা নব্যসাহিত্যিকগণ যাঁহাকে কাণ্ডারী করিয়া তরী ভাসাইয়াছিলাম, তিনিই কি না মাঝদরিয়ায় আসিয়া আমাদিগকে নৌকা হইতে ধাক্কা মারিয়া জলে ফেলিয়া দিলেন—ইংরাজীতে যাহাকে বলে Throwing over-board.

সরকার পক্ষ নবীন সম্প্রদায়ের সাহিত্যকে বিদেশের আমদানী বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু সাহিত্য-সম্রাটের নিকট এ কথা লইয়া আমরা কটাক্ষলাভের আশা করি নাই। আলো যদি আমার অন্তরে আসিয়া থাকে, তাহা কোন্ জানালা দিয়া আসিয়াছে, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না—যদি সে আলো সত্য সত্যই আমার অন্তরের মণিরত্ন উদ্ভাসিত করিয়া থাকে। আমার অন্তর যে কত মণিরত্নে ভর্ত্তি, তাহা কে না জানে? আর কলা-রসের কথা যে বলা হইয়াছে, তাহা আমি যেরূপ বুঝি, রবীন্দ্র-নাথ ততটা কিরূপে বুঝিবেন? কারণ, ঢাকা জেলায় মুন্সীগঞ্জের

নিকটবর্ত্তী রামপালই হইতেছে নানাবিধ সুস্বাদু কলার জন্মস্থান, আর আমার বাড়ী তাহার নিকটবর্ত্তী মৈমনসিংহ জেলায়। যাহা হউক, নূতন সাহিত্য-কলাকে বিদেশের আমদানী বলা রবীন্দ্রনাথের মুখে শোভা পায় না ; কারণ, তাঁহার অপূর্ব্ব সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে অনেকটারই উদ্দীপনা আসিয়াছে পশ্চিমের সাহিত্য ও সমাজ হইতে। বিদেশী কবিতার রসাস্বাদে যাহারা অভ্যস্ত নয়, তাহাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার রসাস্বাদই অসম্ভব। আবার সমগ্র ভাবে ইব্‌সেন্ ও মেটারলিঙ্কএর প্রভাব যে তাঁর লেখায় আসিয়াছে, বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথ তাহা অস্বীকার করিবেন না।

সরকার পক্ষ সাহিত্যের বে-আব্রুতা ও যৌন-সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাহার বিষয়-নির্ণয় স্পষ্ট করিয়া করেন নাই। কোন্ গ্রন্থকারের কোন্ কোন্ পুস্তক তাঁহাদের লক্ষ্য, তাহা খোলসা করিয়া বলা উচিত ছিল। আবার আব্রুতা ও বে-আব্রুতার মধ্যে সীমারেখা কোথায়, তাহাও স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালির" অনেকগুলি দৃশ্য অনেকের মতে অতিরিক্ত বে-আব্রু, "ঘরে বাইরের" অনেকটা ত বটেই। শারীর ব্যাপারমাত্রেই অপাংক্তেয় নয় ; কেন না, চুম্বনের স্থান সাহিত্যে পাকা করিয়া দিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকল সাহিত্য-সম্রাট্। আলিঙ্গনও চলিয়া গিয়াছে। তা' ছাড়া "হৃদয় যমুনা", "স্তন", "বিজয়িনী", "চিত্রাঙ্গদা" প্রভৃতি বহু কবিতায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দৈহিক ব্যাপার লইয়া অপূর্ব্ব রস উদ্বোধন করিয়াছেন। সুতরাং এখানেও একটা সীমা-রেখা আছে, যাহা অতিক্রম করিলেই সাহিত্য বে-আব্রু এই পদবাচ্য হইতে পারে। সেই সীমারেখা কোথায় ?

স্ত্রী-পুরুষের মিলনের দুইটি দিক্ আছে—একটি পশুভাবে, আর একটি মানুষভাবে বা প্রেমের ভাবে। প্রথমটির প্রয়োজন যথেষ্ট আছে,

তাহার সত্যতাও অবিসম্বাদিত, কিন্তু তাহা রস হিসাবে অনর্থক। শুধু প্রেম অর্থাৎ যৌন-সম্বন্ধের মানসিক স্বরূপটাই রস-বিচারে সার্থক হয় বা হইতে পারে। প্রেমের ভিতর একটা আব্রু আছে, কাযেই সেই আব্রুটা ভেদ করিয়া যৌন-মিলনের পশুভাবের আলোচনা সাহিত্যে নিত্যবস্তু হইতে পারে না—বাদী পক্ষের এই যুক্তির মধ্যে অনেকটা ফাঁক আছে। প্রথমতঃ প্রয়োজন অপ্রয়োজন দিয়া কাব্য হিসাবে সার্থকতার অসার্থকতার নির্ণয় হয় না ; দ্বিতীয়তঃ যৌন-সম্বন্ধের যে দিক্‌টা পশুধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা যে রসের বিচারে চিরকালই অনর্থক, এ কথা ঠিক নহে। কবির কাব্য চিরদিনই কেবল মানসিক প্রেম লইয়া সীমাবদ্ধ না থাকিয়া দৈহিক ব্যাপারে আপন সার্থকতা খুঁজিয়াছে ; চুম্বন আলিঙ্গন ছাড়িয়া খুব কম কাব্যই প্রেমের চিত্ররচনায় সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ··কাব্যের মধ্যে দেহের গন্ধ থাকিলেই তাহা কাব্যের নিত্যরসে বঞ্চিত হইবে, এ কথা যে সত্য নহে, তাহার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের বহু রচনায় আছে। অথচ কেবল মাত্র যৌন-সম্বন্ধের শারীর ব্যাপার লইয়া ঘাঁটা-ঘাঁটি করিয়া পাঠকের চিত্তের রিরংসার উপর বাণিজ্য করা যে নিত্য অনিত্য কোনরূপ রসই নয়, তাহাও অস্বীকার করিতে পারি না। সুতরাং আসল কথা, এই দুইয়ের ভিতর সীমা-নির্দ্দেশ। সরকার পক্ষ সেই সীমারেখা কোথায় টানিতে চান, তাহা বুঝা যায় না।

বাদিপক্ষ এ বিষয়ে সাদা কথায় কোন যুক্তি না দিয়া কেবল অলঙ্কারের ছটায় আসল কথা চাপা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আসল কথা হইতেছে এই, রসরচনা ও ইন্দ্রিয়বিলাসের মধ্যে সীমা-নির্দ্দেশ কোন বাহ্য উপায়ে হইতে পারে না। নগ্ন নারীমূর্ত্তি মনোহর রসমূর্ত্তি হইতে পারে, আবার কদর্য্য অশ্লীলতা ও হইতে পারে। এই দুয়ের ভেদ ভাবের ভেদ। যাহা আমাদের রসবোধে সাড়া জাগায়, সেটা আবৃত হউক, অনাবৃত হউক, তাহা আর্ট ; আর যাহা আমাদের রসবোধে সাড়া দেয় না – দিতে

চায় না, কেবল মানুষের পশুপ্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে, তাহা আর্ট নহে। কি চিত্রে, কি গল্পে, কি কবিতায়, আর্ট হিসাবে ভাল-মন্দের ইহা ছাড়া অন্য কোন মানে নাই। ইহা একটা গভীর আধ্যাত্মিক প্রভেদ, যাহার স্বরূপ প্রত্যেক রসজ্ঞ স্বীকার করেন, কিন্তু অরসিককে অন্য কোন বাহ্য লক্ষণ দিয়া বুঝাইবার উপায় নাই।

ইংলণ্ডের সাহিত্যে ভিক্টোরিয়া যুগে চারিদিকে সম্ভ্রম বাঁচাইয়া আব্রু রক্ষা করিয়া রস-রচনার আয়োজন হইয়াছিল। সে সীমালঙ্ঘন করিয়া ফরাসী ও পরে য়ুরোপের অন্যান্য দেশের সাহিত্যিকগণ সেই অপাংক্তেয় বিষয়গুলি হইতে অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি করিয়াছেন। আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান যুগে অনেক স্থলে একটা নিদারুণ উচ্ছৃঙ্খলতা, সাহিত্যের নামে বীভৎস অশ্লীলতা ও ব্যভিচার গজাইয়া উঠিয়াছে, তাহা ত কেহ অস্বীকার করিবেন না। বঙ্গ-সাহিত্যে ও যে এই নূতন প্রেরণার একটা প্রতিঘাত দেখা দিয়াছে, তাহা সত্য। উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সাহিত্যে যে প্রদেশ শিষ্ট-সাহিত্যের বহির্ভূত ছিল, তাঁর ভিতর প্রবেশ করিয়া একাধিক সাহিত্যিক রসসৃষ্টির আয়োজন করিয়াছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমানে বাঙ্গলা সাহিত্যে এমন কতকগুলি বই অবশ্য জন্মিয়াছে, যার সম্বন্ধে অসঙ্কোচে বলা যায় যে, তাহারা একটা শারীর ব্যাপার লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া মানুষের একটা নিকৃষ্ট বৃত্তির সেবা করিয়াছে মাত্র, তাহা লইয়া কোন রস উদ্বোধন করে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সরকার পক্ষ যদি এই শ্রেণীর সকল বইকেই অনিত্য বলিয়া ভাসাইয়া দিতে চান, তবে তাঁদের এ নিষ্পত্তি চরম বলিয়া মানিয়া লইতে আমরা বাধ্য হইব না। আমার সহযোগিগণের অনেক বই এই শ্রেণীর থাকিতে পারে, কিন্তু আমার একখানা বই ও শারীর রসে ভরপূর হইয়াও নিত্য রসবর্জ্জিত নহে, এ কথা আমি বুক ঠুকিয়া বলিতে পারি। "ছোট সাহিত্য সম্রাট্" আমাকে যে সার্টিফিকেট দিয়াছেন, তাহা আপনারা দেখিতে পারেন।

আমার শেষ কথা এই, রাজনীতিক্ষেত্রের ন্যায় সাহিত্যেও অটোক্রেসির যুগ চলিয়া গিয়াছে, এখন ডিমোক্রেসির যুগ। সম্রাটের কথাই যে আইন, ইহা আমরা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। এখন প্রবল জনমতের দ্বারা সাহিত্যের নিত্যতা অনিত্যতার যাচাই হইবে। সরকার পক্ষ যাহাকে সাহিত্যের বাজারে হট্টগোল বলিয়া গালি দিয়াছেন, তাহা হট্টগোল নহে, তাহা ভোটের গোল। সাহিত্যগগনে এক চন্দ্রের (বঙ্কিম) অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন রবির উদয় হইয়াছিল, রবির ও সেইরূপ দশা-বিপর্য্যয় আসন্ন-প্রায়। ঐ দেখুন, শরতের পূর্ব্বাকাশে আর একটি চন্দ্রের প্রভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা নব্য সাহিত্যিকগণ তাঁহার অভিনন্দন করিয়া বলিতেছি :—

"The old order changes, yielding place to the new—
And God fulfills Himself in many ways."

বিবাদী পক্ষের উকীল-প্রধান এইরূপে তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। তখন উকীল-সরকার তাঁহার জবাব দেওয়ার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—

মাননীয় বিচারপতি এবং জুরি মহোদয়া ও মহোদয়গণ! আমার সুবিজ্ঞ বন্ধু তাঁহার এই গভীর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা আমার কায অতি সহজ করিয়া দিয়াছেন। আমার আর প্রমাণ-প্রয়োগের আবশ্যক হইবে না। এই মোকদ্দমার যাহা বিচার্য্য বিষয়, তাহা তিনি নিজেই একরূপ স্বীকার করিয়াছেন। প্রথম কথা, আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্য যৌন-মিলনের দৈহিকতার চিত্র দ্বারা কলুষিত হইতেছে কি না? আমার সুবিজ্ঞ বন্ধু তাহা স্বীকার করিয়া বলিলেন, হাঁ হইতেছে—বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যে এমন অনেক বই জন্মাইয়াছে, যাহারা শারীর ব্যাপার লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া মানুষের একটা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সেবা করিয়াছে,—তবে তিনি নিজে সে দলের নহেন। সে কথা আমরা পরে বিবেচনা করিব। দ্বিতীয় কথা,

এই সকল ভাব বিদেশ হইতে আমদানী কি না? তাহাও তিনি স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—ইংলণ্ডের ভিক্টোরিয়া যুগের পরবর্ত্তী য়ুরোপীয় সাহিত্যিকগণ সাহিত্যরচনায় আব্রু রক্ষা করেন নাই এবং সেই উচ্ছৃঙ্খলতার ঢেউ বঙ্গদেশেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তবে তিনি এ কথাও বলিয়াছেন, আলো যদি আমার অন্তরে আসিয়া আমার হৃদয়ের মণিরত্ন উদ্ভাসিত করে, তাহা কোন্ জানালা দিয়া আসিল, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। এ কথা খুবই সত্য। বিদেশীয় ভাবমাত্রই দূষণীয় নহে, তবে তাহা আমাদের নিজের ধাতের সঙ্গে ও আভিজাত্যের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লওয়া চাই। বিষবৃক্ষের সূর্য্যমুখীর স্বামী নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিবার পরে সূর্য্যমুখী নিরুদ্দেশ হইলেন, ইহা আমাদের জাতির ধাতের সহিত খাপ খাওয়ান কঠিন, কিন্তু যদি কোন নায়িকা তাহার স্বামীর নির্য্যাতনে গৃহত্যাগ করিয়া রাগের ভরে থিয়েটারের ষ্টেজের উপর যাইয়া উপস্থিত হয়, তবে সে একেবারেই অগ্রাহ্য। এ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন—"idea পশ্চমের কি উত্তরের, ইহা বড় কথা নয়, স্বদেশের কি বিদেশের তাহাও বড় কথা নয়, বড় কথা, ইহা ভাষার ও জাতির কল্যাণকর কি না।" বিলাতের আমদানী এই সকল উচ্ছৃঙ্খল ভাব যে আমাদের ভাষার ও জাতির কল্যাণকর নহে, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। আমার সুবিজ্ঞ বন্ধু ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, সেই সকল পুস্তক প্রকৃত সাহিত্য-রস উদ্বোধন করে না। আপনারা সকলেই জানেন, "ন চ মুক্তা গজে গজে"—সকল শুক্তির মধ্যে যেমন মুক্তা জন্মে না, সকল গজের মাথায়ও মুক্তা জন্মে না। প্রকৃত সাহিত্য-রসসৃষ্টি একটি ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা। যাহা হউক, আমার সুবিজ্ঞ বন্ধু, যে সকল পুস্তক নিষিদ্ধ স্থান হইতে রস সংগ্রহ করিয়াছে—(সে কি রস?) তাহার সবগুলিকেই অগ্রাহ্য করিতে চান না, বিশেষতঃ তাঁহার নিজের গুলিকে। কোন্ কোন্ গ্রন্থ অগ্রাহ্য, সে বিচারের ভার জুরি-

দিগের উপর, সরকার পক্ষ তাহার তালিকা দিতে চান না। তবে একটি কথা আমার সুবিজ্ঞ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিতেছি,—নব্যদলের অনেক সাহিত্যিক থাকিতে তিনি কেন স্বয়ং নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি হইয়া এখানে দাঁড়াইয়াছেন? ইংরাজিতে একটা কথা আছে—conscience makes cowards of us"—অর্থাৎ ঠাকুর-ঘরে কে? কলা খাই না—তাঁহার সম্বন্ধে এই কথাটি প্রযোজ্য কি না? আবার কলা-রসজ্ঞতা সম্বন্ধে তাঁহার নিজের সম্বন্ধে তাঁহার খুব উচ্চধারণা আছে সন্দেহ নাই, তাহা সেই রামপালের কলা সম্বন্ধে হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্য-কলা সম্বন্ধে কি না? আমাদের ভাবী সাহিত্য-সম্রাট্ তাঁহাকে যে সার্টিফিকেট দিয়াছেন, তাহাতে ত কলারসজ্ঞতার উল্লেখ নাই। সেই সার্টিফিকেট আমি আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইতেছি,—"পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানে, ভাষার অধিকারে, চিন্তার বিস্তারে এবং সর্ব্বোপরি স্বাধীন অভিমতের অকুণ্ঠিত প্রকাশে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার সমতুল্য লেখক কেহ আছেন বলিয়াও স্মরণ হয় না।" যাহা হউক, এইসব ব্যক্তিগত বিষয়ের আলোচনা আমার না করাই উচিত ছিল; বিশেষতঃ আমার সুবিজ্ঞ বন্ধু যখন নিজেকে এক জন আসামী বলিয়া মনে করেন, তখন সরকার পক্ষ হইতে আসামীর Character (চরিত্র) সম্বন্ধে আলোচনা করা নিষিদ্ধ। কিন্তু আমার সুবিজ্ঞ বন্ধু নিজেই নিজের কথা উত্থাপন করিয়া আমাকে এ সব অপ্রিয় কথা বলিতে বাধ্য করিলেন।

সে যাহা হউক, যৌন ব্যাপার লইয়া রচিত গ্রন্থরাশির মধ্যে কোন্‌গুলি নিত্য সাহিত্য-রসপুষ্ট আর কোন্‌গুলি রাবিস, এ বিষয়েও আমার সুবিজ্ঞ বন্ধু বিচারের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, রস রচনা ও ইন্দ্রিয়-বিলাসের মধ্যে সীমা-নির্দ্দেশ কোনও বাহ্য উপায়ে হইতে পারে না। একটি নগ্ন নারীমূর্ত্তি মনোহর রসমূর্ত্তি হইতে পারে, আবার কদর্য্য অশ্লীলতাও হইতে পারে, যাহা আমাদের রসবোধে সাড়া জাগায়—সেটা

আবৃত হউক, অনাবৃত হউক, তাহা আর্ট ; আর যাহা রসবোধে সাড়া না দিয়া পশুবৃত্তিকে জাগায়, তাহা আর্ট নহে। ইহাকেই যদি রস-বিচারের মূল সূত্র ধরিয়া লওয়া যায়, তবে এখানে বুঝিতে হইবে, "আমাদের" মানে কাহাদের ? এক জন লম্পটের সূক্ষ্ম শিল্প-বিচারের অধিকার নাই ; কারণ, নগ্নমূর্ত্তিমাত্রেই তাহার মনে পশুভাব জাগাইবে। আবার একজন উচ্চাঙ্গের শিল্পী বা কবি যে চক্ষু দিয়া আর্টের বিচার করিবেন, একজন সাধারণ লোক সুশিক্ষিত হইলেও তাঁহার সে চক্ষু না থাকিতে পারে। এ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র অতি সঙ্গত কথাই বলিয়াছেন,—"সমস্তই নির্ভর করে লেখকের (অথবা বিচারকের) শিক্ষা, সংস্কার, রুচি ও শক্তির উপরে।" আমাদের মাননীয় বিচারপতি আধুনিক সাহিত্যের অনেক বইকে 'prima facie' (প্রথম দৃষ্টিতে) রাবিস বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, কিন্তু সেগুলিকে সরাসরি অগ্নিসাৎ করিবার আদেশ না দিয়া সূক্ষ্ম বিচারের জন্য এই জুরি আহ্বান করিয়াছেন।

এখন কথা হইতেছে, আদিরসের যে দুইটা দিক্ প্রেম ও কাম, তাহার মধ্যে প্রেম অবলম্বনে যদি খাঁটি স্থায়ী সাহিত্য রচিত হইতে পারে, তবে কাম অবলম্বনে তাহা হইবার বাধা কি ? আমার সুবিজ্ঞ বন্ধু বলেন, কিছু বাধা নাই। কবির কাব্য চিরদিনই কেবল মানসিক প্রেম লইয়া সীমাবদ্ধ না থাকিয়া দৈহিক ব্যাপারেও আপন সার্থকতা খুঁজিয়াছে। শরৎ বাবু বলেন,—ভিত্তির মত ও-বস্তুটি সাহিত্যের গভীর ও গোপন অংশেই থাক্। বনিয়াদ যত নীচে এবং যতই প্রচ্ছন্ন থাকে, অট্টালিকা ততই সুদৃঢ় হয়, ইহাই সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের মত। শরৎ বাবু নিজেও না কি আলিঙ্গন ও চুম্বন তাঁহার বইয়ের মধ্যে দিতে পারেন নাই, অথচ তাঁহার উপন্যাসে আদিরসের চূড়ান্ত দেখাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে, বৈষ্ণব-সাহিত্যে কাম ও প্রেমের মধ্যে সীমানির্দ্দেশের কিরূপ চেষ্টা হইয়াছে, দেখা যাক্। কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিয়া সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত কেবল॥"

যদি বলা যায়, কাম ও প্রেমের এই পার্থক্য-বিচার সমীচীন নহে; কারণ, কৃষ্ণকে ইন্দ্রিয়সম্ভোগ দ্বারা প্রীতি দিতে যাইয়া গোপীদের কি সেই সঙ্গে সুখ হয় নাই? আর প্রেম ত ইন্দ্রিয়সম্ভোগের ব্যাপার নহে। ইহার উত্তর এই,—ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণের সহিত বংশরক্ষা-ঘটিত পশুধর্ম্মের চর্চ্চা করেন নাই, তাঁহাদের কামের অর্থ অন্যরূপ (অবশ্য গীত-গোবিন্দাদি কোন কোন গ্রন্থে শারীর-ব্যাপার-জনিত কামের চিত্র দেখা যায়,—সেগুলি গ্রন্থকারের শিক্ষা, সংস্কার ও রুচি বশতঃ হইয়াছে)। কৃষ্ণের প্রতি চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সমর্পণই তাঁহাদের কাম। তাঁহাদের সেই অনুশীলনের ফলে তাঁহারা কৃষ্ণকে সর্ব্বময় দেখিতেন (যথা যথা আঁখি যায় তথা কৃষ্ণ স্ফুরে)। আর কৃষ্ণ-প্রেম করিয়া তাঁহারা আত্মসুখ সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী বলেন,—

"লোকধর্ম্ম বেদ-ধর্ম্ম সেবা-ধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জাধৈর্য্য দেহ সুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেমের সেবন॥

অর্থাৎ স্থূলদেহ ও তাহার আকাঙ্ক্ষা, সংসার-সুখ, লোক-ধর্ম্ম বেদ-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন—এক কথায় সর্ব্বত্যাগ করিয়া কৃষ্ণে আত্মসমর্পণের নামই গোপীর প্রেম। কাম কেবল আত্ম-তৃপ্তিতেই সীমাবদ্ধ, প্রেমের ধর্ম্ম

অসীম আত্মসম্প্রসারণ। কাম অল্পে পরিতুষ্ট, প্রেমের বিশালতা অনন্ত, গভীরতা অতলস্পর্শ। প্রেম অল্পে তুষ্ট না হইয়া ভূমার স্পর্শে মহীয়ান্। ইহাই প্রেমের সৌন্দর্য্য। যে সাহিত্য প্রেমের এই সৌন্দর্য্য ফুটাইতে পারে, তাহাই নিত্যরসে ভরপূর। একজন ইংরাজ সমালোচক বলিয়াছেন—

"It is the very nature of beautiful things to suggest something more and higher; there is a certain infinity in all our best emotions. * * * * Great beauty always suggests infinity."

অর্থাৎ সুন্দর বস্তুর স্বভাবই এই যে, তাহা কিছু অতিরিক্ত ভাবের ব্যঞ্জনা করে। আমাদের সর্ব্বপ্রকার উৎকৃষ্ট ও উচ্চতর অনুভূতির মধ্যে অনন্তের আভাস পাওয়া যায়। * * * * যাহা অত্যন্ত সুন্দর, তাহাই অনন্তের আভাস দেয়। শিশুর খেলার রাঙ্গা পুতুল তাহাকে আনন্দ দেয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা ক্ষণিক। আবার এক জন ভোজনবিলাসী বয়স্ক ব্যক্তি সন্দেশ-রসগোল্লা খাইয়া যে সুখ পায়, তাহাও ক্ষণিক, পেট ভরিয়া গেলে আর তাহাতে সুখ পায় না। এইরূপে এক জন ইন্দ্রিয়বিলাসীরও ইন্দ্রিয়সুখ অল্পক্ষণস্থায়ী। এই সকল অল্প পরিতৃপ্ত অনুভূতির মধ্যে অনন্তের আভাস নাই, সুতরাং ইহারা নিত্য সাহিত্য-রসের উপাদান হইতে পারে না। যে অনুভূতির মধ্যে অনন্তের আভাস আছে, কেবল তাহাই প্রকৃত সৌন্দর্য্যের খনি এবং স্থায়ী সাহিত্য-সম্পদের উপাদান। এই জন্য Mathew Arnold বলিয়াছেন—"High seriousness is an essential characteristic of really great literature."—বলা বাহুল্য, কামে তাহা নাই; সুতরাং কাম অবলম্বনে স্থায়ী সাহিত্যসৃষ্টি হইতে পারে না। আমি Winchester এর আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করি;—

"Literature depicts human life and character with some end in view; not merely for the sake of depicting them. And the end in view in the case of the forms of literature specially concerned in the discussion that is poetry and fiction, is to awaken emotion. But if the depiction of any phase of human life arouse only unpleasant, repulsive or degrading emotions, then such depiction is forbidden by the purpose of literature as well as by the laws of morality."

সরকার-পক্ষের উকীল এইরূপে তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিয়া উপবেশন করিলেন। তখন বিচারপতি জুরিদিগের দিকে তাকাইয়া তাঁহার চার্জ্জ দিতে আরম্ভ করিলেন ;—

আপনারা অবশ্য জানেন, জুরির বিচারে জজের কার্য্য হইতেছে—আইনের ব্যাখ্যা করা (to interprete the law) আর জুরিদিগের কার্য্য হইতেছে—মোকদ্দমার তথ্য নিরূপণ করা (to determine the facts), আপনারা উভয় পক্ষের সুবিজ্ঞ উকীলদের বক্তৃতা শুনিয়াছেন। আমি আশা করি, আপনারা ইহা হইতে নিরপেক্ষভাবে তথ্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবেন। প্রতিবাদি-পক্ষের সুবিজ্ঞ উকীল মোকদ্দমার বিচার্য্য বিষয় নিজেই অনেকটা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, ইহা দ্বারা আপনাদের কায অনেকটা সহজ হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দেশের নবীন লেখকদের সঙ্গে আমার যেরূপ পরিচয় হয়েছে, তা'তে আমি তাঁদের বলিষ্ঠ কল্পনা ও ভাষা সম্বন্ধে সাহসিক অধ্যবসায় দেখে বিস্মিত হয়েছি। কিন্তু শক্তির একটা নূতন স্ফূর্ত্তির দিনেই শক্তিহীনের কৃত্রিমতা সাহিত্যকে আবিল ক'রে তোলে। সন্তরণপটু যেখানে অবলীলাক্রমে পার হয়ে যাচ্ছে, অপটুর দল সেইখানেই উদ্দাম ভঙ্গীতে কেবল নীচেকার পাঁককে উপরে

আলোড়িত করতে থাকে। অপটুই কৃত্রিমতার দ্বারা নিজের অভাব-পূরণ করতে প্রাণপণে চেষ্টা করে, সে রূঢ়তাকে বলে শৌর্য্য. নির্লজ্জতাকে বলে পৌরুষ। বাঁধি গতের সাহায্য ছাড়া তার চলবার শক্তি নেই বলেই সে হাল আমলের নূতনত্বেরও কতকগুলি বাঁধি বুলি সংগ্রহ ক'রে রাখে। বিলিতী পাকশালায় ভারতীয় কারির যখন নকল করে, শিশিতে কারি-পাউডার বাঁধা নিয়মে তৈরি ক'রে রাখে; তাতে মিশিয়ে দিলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে কারি হয়ে ওঠে; লঙ্কার গুঁড়ো বেশী থাকাতে তার দৈন্য বোঝা শক্ত হয়। আধুনিক সাহিত্যে সেই রকম শিশিতে সাজানো বাঁধি বুলি আছে. অপটু লেখকদের পাকশালায় সেইগুলি হচ্ছে "রিয়ালটীর কারি-পাউডার।" ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্র্যের আস্ফালন, আর একটা লালসার অসংযম। আপনারা এই দুই রকম পাউডারের ঝাঁঝ দ্বারাই নবীন সাহিত্যের পরিচয় বুঝতে সমর্থ হবেন। সাহিত্যে লালসা ইতঃপূর্ব্বে স্থান পায়নি বা এর পরে স্থান পাবে না, এমন কথা সত্যের খাতিরে বলতে পারি নে। কিন্তু ও জিনিষটা সাহিত্যের পক্ষে বিপজ্জনক। বলা বাহুল্য, সামাজিক বিপদের কথা আমি ভুলছি নে। বিপদের কারণ হচ্ছে, ওটা অত্যন্ত সস্তা, ধূলোর উপরে শুয়ে পড়ার মতই সহজসাধ্য। অর্থাৎ ধূলোয় যার লুটোতে সংকোচ নেই, তার পক্ষে একেবারেই সহজ। পাঠকের মনে এই আদিম প্রবৃত্তির উত্তেজনা সঞ্চার করা অতি অল্পেই হয়।…বড় একটা সাহিত্যের গুণ হচ্ছে অপূর্ব্বতা, অরিজিনালিটি। সাহিত্য যখন অক্লান্ত শক্তিমান্ থাকে, তখন সে চিরন্তনকে নূতন করে প্রকাশ করতে পারে। এই তার কাজ। একেই বলে অরিজিনালিটি। যখনই সে আজগুবিকে নিয়ে গলা ভেঙ্গে, মুখ লাল ক'রে কপালের শিরগুলোকে ফুলিয়ে তুলে, ওরিজিনাল হ'তে চেষ্টা করে, তখনই বোঝা যায়. শেষ দশায় এসেছে। রূপ যাদের ফুরিয়েছে, তাদের পক্ষে আছে পাঁক। তারা বলে, সাহিত্য-ধারায় নৌকা

চলাচল অত্যন্ত সেকেলে, হালের উদ্ভাবনা হচ্ছে পাঁকের মাতুনি—এতে মাঝিগিরির দরকার নেই, এটা তলিয়ে যাওয়ার রিয়েলিটি। ভাষাটাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে, অর্থের বিপর্য্যয় ঘটিয়ে, ভাবগুলোকে স্থানে অস্থানে ডিগ্‌বাজি খেলিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ। আপনারা সাহিত্যের পাকা জহুরী, আশা করি, আপনারা সহজেই এই সকল লক্ষণ দ্বারা অপ-সাহিত্যকে বাছিয়া বাহির করিতে পারিবেন। আপনারা উভয় পক্ষের বক্তৃতা শুনিয়াছেন, আমারও মন্তব্য শুনিলেন, এখন আপনারা মন্ত্রণা গৃহে যাইয়া সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া আপনাদের ভারডিকট্ (virdict) আমাকে জ্ঞাপন করুন।

বিচারপতির বক্তব্য শেষ হইলে, জুরিগণ মন্ত্রণাগৃহে গমন করিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তাঁহারা এজলাসে ফিরিয়া আসিলে, বিচারপতি তাঁহাদের মুখপাত্র শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আপনারা সকলে একমত (unanimous) হইয়াছেন কি ?"

রামানন্দ বাবু তাঁহার দীর্ঘ পক্ক শ্মশ্রু তর্জ্জনী দ্বারা ভেদ করিয়া বলিলেন,—

"মাননীয় বিচারপতি ! আমরা একমত হইয়াছি, আবার হইও নাই।"

বিচারপতি মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন,—

"সে কেমন ? কথাটা খোলসা ক'রে বলুন।"

রামানন্দ বাবু বলিলেন—

"নব্যসাহিত্যিকগণের নাড়ী অত্যন্ত রসস্থ হওয়ায় সাহিত্যে ঘোর রুচিবিকার হইয়াছে, এ বিষয়ে আমরা সকলে একমত। এখন ইহার চিকিৎসা কিরূপ হইতে পারে, সে বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে। আমার মতে আদিরসকে একেবারে সাহিত্য হইতে নির্ব্বাসন করাই উচিত। জলধর বাবুও হুঁ বলিয়া সেই মতে সম্মতি দিয়াছেন।

কিন্তু সুরসিক মিঃ চৌধুরী বলেন—উঁহু—তা হ'তে পারে না। তা' হ'লে সাহিত্যই একেবারে মারা যাবে। এ যেন ছারপোকার দৌরাত্ম্য নিবারণের জন্য ঘরে আগুন দেওয়া। নব্যলেখকদিগকে একটা ওয়ার্ণিং (ধমক) দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হোক। প্রভাত বাবু বলিলেন—কেবল ওয়ার্ণিংয়ে চলিবে না, তাহাদিগের ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইনের ৫৬২ ধারা মতে জামিন মুচলিখা নিলেই ভাল হয়। অবশেষে শ্রীমতী সরলা দেবী বলিলেন,—আদিরস মাত্রেই ত দোষের নয়, মানসিক প্রেম সাহিত্যে আনিলে কোন দোষ নাই, বরং তাহা থাকাই উচিত। নচেৎ সাহিত্য স্ত্রীলোকের অপাঠ্য হইয়া উঠিবে। শারীর ব্যাপারটাই অশোভন, সেটাকে বর্জ্জন করাই কর্ত্তব্য। আমাদের এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মত আপনাকে জানাইলাম। এখন আপনি যাহা ভাল মনে করেন, সেইরূপ হুকুম দিন।"

অতঃপর বিচারপতি হুকুম দিলেন,—আদিরসের অন্তর্গত শারীর ব্যাপার অর্থাৎ কামকে তিন বৎসরের জন্য সাহিত্য হইতে বর্জ্জন করা হউক, অর্থাৎ কামের transportation for three years.

বিচারপতির রায় প্রকাশ হইলে সাধারণ লোক সকল ৩ বৎসরের দ্বীপান্তর বলিয়া কোলাহল করিতে করিতে বাহির হইল। নব্যসম্প্রদায়ের সাহিত্যিক দল, বিশেষতঃ স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ নিতান্ত বিমর্ষভাবে আদালত-গৃহ ত্যাগ করিলেন।

সম্পূর্ণ